SUVOM





ANIK



পিশাচ কাহিনী

পিশাচের পাল্লায়

অনীশ দাস অপু

পিশাচ কাহিনী

পিশাচের পাল্লায়

অনীশ দাস অপু

পিশাচ কাহিনীর অনুরাগী পাঠকের জন্য এ বই।
চমৎকার কিছু পিশাচ কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে বইটিতে।
'মার্ভ ভিও' পড়ার সময়ে ছম ছম করে উঠবে গা।
বুকে যথেষ্ট সাহস না থাকলে গভীর রাতে
'হলদে পা' পড়া বারণ। 'পিশাচের পাল্লায়' ও
'হানা বাড়ি. পড়ে শিউরে উঠবেন।
ভয়', 'ডাইনি' ও 'শিকার' দারুণভাবে
চমকে দেবে আপনাকে। এ ছাড়া অন্যান্য গল্পগুলোও
আপনাকে চমকিত করবে। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা প্রার্থনীয়!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পিশাচ কাহিনী

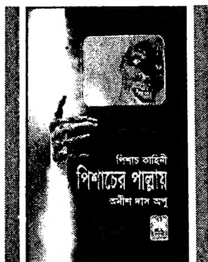
পিশাচের পাল্লায়

অনীশ দাস অপু

পিশাচ কাহিনী

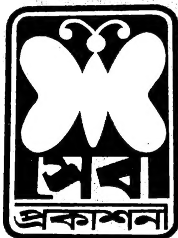
পিশাচের পাল্লায়

অনীশ দাস অপু





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০



ত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-0224-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PISHACHER PALLAY
Horror Stories
By: Anish Das Apu

মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
সুজনেষু
যিনি 'ঐতিহ্য' দিয়ে স্বল্প সময়ে
প্রকাশনার জগতে সৃষ্টি করেছেন আশ্চর্য আলোড়ন!

সূচি

মার্ভ ভিও

পুরানো কটেজটায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে নেমে এল সাঁঝের আঁধার। আমার মত শহুরে মানুষের জন্য গ্রামে যাতায়াত কঠিন কাজই বটে। আমাকে বলা হয়েছিল কর্ক সিটির কেন্দ্র থেকে সোজাসুজি একুশ মাইল রাস্তা পার হলেই কটেজটা চোখে পড়বে। কিন্তু আয়ারল্যান্ডে মাইলগুলো বড্ড গোলমেলে। লোকে 'আইরিশ মাইল' বলে ঠাট্টা করে এ জন্যই। বোগেরাগ পর্বতমালার ছায়ায় শুয়ে আছে কটেজটা। এদিকে সারাক্ষণ হু হু করে বাতাস বইছে, ন্যাড়া গুল্ম ছাড়া কিছু জন্মায় না। পাহাড়ের ধূসর গ্রানিট বুকে খোঁচা খোঁচা দাড়ির মত খড় ছিটিয়ে আছে। বাতাস এখানে পাথরের গায়ে বাড়ি খেয়ে শিস তোলে, পাক খেতে খেতে উঠে যায় উপরে। এরকম এলাকায়, উঁচু-নিচু রাস্তা আর পাথুরে ঢাল ধরে হেঁটে আসতে কমপক্ষে দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। তবে মাইলখানেক রাস্তা আবার মোটামুটি মন্দ নয়। প্রশ্ন জাগতে পারে এই অচেনা, আতিথেয়তাশূন্য জায়গায় আমি কী করছি? এদিকে আসবার কোন খায়েশ ছিল না আমার। কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষকে পেটের টানে অনেক জায়গাতেই যেতে হয়। আর আমি বেঁচে আছি RTE'র উপর নির্ভর করে। এটি আইরিশ স্টেট টেলিভিশন। কাজ করছি টেলেফিস আয়ারিয়্যানের সঙ্গে। এক প্রযোজকের মাথায় হঠাৎ ঢুকেছে আইরিশ ফোক প্রথার উপর একটা প্রোগ্রাম বানাবে। দায়িত্বটা আমাদের উপর বর্তেছে। ফলে আমাকে পুরানো বইয়ের দোকানে ঢুঁ মারতে হলো, যেখানে অকাল্ট সাহিত্যের উপর বই মেলে। রিভার লী'র সিয়ারেস

স্ট্রীটের ছোট একটি গলিতে দোকানটা। এ এলাকার বর্ণনা কর্ক সাহিত্যে আছে। আর এখানে ট্যুরিস্টদের আনাগোনাও একসময় কম ছিল না। সে স্বর্ণযুগ গত হয়েছে অনেক আগে, এখন এ এলাকায় কারিগরদের বাড়িঘর আর দোকানপাট ছাড়া কিছু নেই।

আমাকে বলা হয়েছে মৃতদের সাথে জড়িত কুসংস্কারের বিষয় খুঁজে বের করতে। আমি এ বিষয়ে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি, এক বৃদ্ধা এসে দাঁড়াল পাশে। উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল কী পড়ছি।

'তুমি আইরিশ প্রথা আর মৃতদের সাথে কুসংস্কারের সম্পর্কের বিষয়ে আগ্রহী দেখতে পাচ্ছি,' তীক্ষ্ণ, ধারাল গলায় বলে উঠল সে। মুখ তুলে তাকালাম তার দিকে। ছোটখাট গড়ন, কাঁধজোড়া নুয়ে গেছে সামনের দিকে। পরনে লম্বা, কালো পোশাক, তার সাথে মেলানো বড় হ্যাট এবং ঘোমটা, যেন ভিক্টোরিয়ান নাটক থেকে উঠে আসা কোন চরিত্র। চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত, তবে মহিলার পোশাকের ধরনে মনে হয় প্রাচীন মানুষ। অনেক প্রাচীন, যাকে সময় প্রায় ভুলে গেছে।

'জ্বী,' বিনীত গলায় সায় দিলাম আমি।

'ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়। ওয়েস্টকর্কে মৃতদের নিয়ে অনেক গল্প আছে, যারা জীবন ফিরে পেয়েছিল। গ্রামে গেলে এদেরকে নিয়ে অবিশ্বাস্য সব গল্প শুনতে পাবে তুমি।'

'সত্যি?' মৃদু গলায় প্রশ্ন করলাম। 'জোম্বিদের কথা বলছেন?' বিরক্তির ভঙ্গিতে নাক টানল মহিলা।

'জোম্বি! ওটা তো আফ্রিকার ভুডু কুসংস্কার। তুমি আয়ারল্যান্ডে রয়েছ, যুবক। না, আমি মার্ভ ভিও'র কথা বলছি।'

'ওটা কী জিনিস?' জানতে চাইলাম আমি।

'বেঁচে থাকা লাশ,' জবাব দিল বৃদ্ধা। 'আয়ারল্যান্ডের গ্রাম্য এলাকায় মার্ভ ভিওদের নিয়ে অনেক গল্প আছে।'

আবার নাক টানল সে। অভ্যাস। বদভ্যাসও বলা যায়।

'আমি সত্যি কথাই বলছি, যুবক। এমন সব গল্প আছে, শুনলে তোমার ঘাড়ের সমস্ত চুল সরসর করে খাড়া হয়ে যাবে। অবিশ্বাস্য এবং ভয়ঙ্কর সব গল্প। জ্যান্ত কবর দেয়ার কাহিনী। টাগ ও ক্যাথেনের গল্প, বদমাইশীর জন্যে একে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, প্রতি রাতে ভয়ঙ্কর এক জিন্দালাশ বা মার্ভ ভিও তাকে নির্যাতন করত। লাশটা চাইত তাকে কবর দেওয়া হোক। সে লোকটাকে গির্জার কবরখানায় নিয়ে যেত, মৃতেরা উঠে আসত কবর থেকে। কিন্তু কেউ লাশটাকে কবর দিতে রাজি হত না। আরও লাশ আছে যারা ভূতুড়ে হ্রদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে পানিতে ডুবে মরা মানুষ খাওয়ার জন্যে। আরও দারুণ দারুণ গল্প তুমি শুনতে পাবে ওখান থেকে মাইল খানেক রাস্তা গেলেই।'

চট করে একটা বুদ্ধি এসে গেল মাথায়।

'স্থানীয় কাউকে চেনেন আপনি যে এসব গল্প জানে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'আমি একটা টেলিভিশন প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছি, তাই এমন কারও সঙ্গে কথা বলা দরকার…'

আবার নাক টানল সে। 'মার্ভ ভিও সম্পর্কে জানে এমন কারও সঙ্গে কথা বলতে চাইছ?'

হাসলাম আমি। বৃদ্ধা এমনভাবে কথাটা বলল যেন আমি মৌমাছির চাষ কীভাবে করতে হয় জানার জন্য সেরকম কাউকে খুঁজছি। দ্রুত উপর-নীচে মাথা ঝাঁকালাম।

'তা হলে মুশেরামোর পাহাড়ে চলে যাও, "টিচ ড্রচ চু" কোথায় জিজ্ঞেস করবে। টিচ ড্রচ চুতে ফাদার নেসান ডোহেনিকে পাবে। তাঁর সঙ্গে কথা বললেই হবে।'

হাতের বইটা নামিয়ে রাখলাম আমি, হাত বাড়ালাম অ্যাটাশে কেসের দিকে, বের করলাম নোটবুকটা। বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই একটা ধাক্কা খেলাম। নেই! চলে গেছে বুড়ি। মুহূর্তের মধ্যে যেন হাওয়া হয়ে গেছে। দোকানের মালিক বসে দোতলায়। বৃদ্ধার কথা জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

বুড়িকে সে দেখেছে কিনা বা চেনে কিনা। ডানে-বামে মাথা নাড়ল সে। শ্রাগ করে নিজের কাজে মন দিলাম। বৃদ্ধার বলা নামগুলো লিখে নিলাম নোটবুকে। পুরানো বইয়ের দোকানে এরকম অদ্ভুত মানুষ কত আসে। তবে বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হয়েছে। সারাদিন বই ঘাঁটাঘাঁটির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। ভাল টেলিভিশন প্রোগ্রামে লোকে মানুষ-জন, গল্প বলিয়েদের দেখতে চায়, উপস্থাপকের রসহীন একঘেয়ে বক্তৃতা শুনতে চায় না।

মুশেরামোর বোগেরাগ পর্বতের সবচে' বড় চুড়ো। কর্ক শহর থেকে বেশি দূরে নয়। ফোন বুক উল্টেপাল্টে দেখেও ফাদার নেসান ডোহেনি বা টিচ ড্রচ চু বলে কোন নাম তালিকায় চোখে পড়ল না। তবে জায়গাটি যেহেতু কাছে, ভাবলাম একুশ মাইল দূরে হলেও মুশেরামোর থেকে ঘুরে সেদিনই শহরে ফেরা যাবে। বলতে ভুলে গেছি আমি খুব ভাল মোটর সাইকেল চালাতে জানি। মোটর চালানো আমার শখ। ধর্মযাজক বা পাদ্রির সঙ্গে কথা বলে মাঝরাতের আগে ফিরে আসতে পারব, মনে মনে হিসাব করলাম।

কর্কের সোজা এবং চওড়া একটি রাজপথ ম্যাক্রুম। ওই রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম আমি। তারপর উত্তর দিকে মোড় নিলাম। এদিকে ছোট একটি রাস্তা চলে গেছে বালিনাগরি নামের গ্রামে। গ্রামটি দূরে, মুশেরামোরের কালো একটি চুড়োয় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সহজ যাত্রা। আমি স্থানীয় একটি গ্যারেজে বাইক থামালাম, তেল ভরলাম। গ্যারেজের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম টিচ ড্রচ চুটা কোন দিকে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সে। যেন-খুব গোপন কোন ব্যাপারে জানতে চেয়েছি তার কাছে। 'কেন এসেছ তা জানি' ধরনের হাসি ফুটল তার চেহারায়, তারপর বলে দিল কীভাবে পৌঁছুতে হবে গন্তব্যে।

এরপরে শুরু হলো আমার আসল যাত্রা।

ঘণ্টাখানেক লাগল লোকজনকে জিজ্ঞেস করে গন্তব্যে

পৌছুতে। লজ্জা লাগলেও স্বীকার করছি, আমার আইরিশ উচ্চারণ তেমন সুবিধের নয়। যে দেশের মানুষ দ্বিভাষা-ভাষী, এবং ইংলিশ যেখানে আইরিশের চেয়ে বেশি বলা হয়, সেখানে দ্বিতীয় ভাষাটা কেউ কম জানলেও তাতে তেমন কিছু এসে যায় না। যা হোক, আমি জানলাম, 'টিচ' মানে আইরিশ ভাষায় বাড়ি। যদিও পুরো অর্থটা এ থেকে পরিষ্কার হলো না। তবে বহু কষ্টে কটেজটা খুঁজে পাবার পরে ওটাকে 'বাড়ি' বলা যাবে কিনা ভেবে সন্দেহ হলো আমার।

ওটা পাহাড়ের ঠোঁটের সামনে, ঠেলে বেরিয়ে আসা গুহার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের অন্ধকার সারি বেড়ার মত সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন, সেঁতসেঁতে এবং বিষণ্ন লাগল কুটিরটাকে। ওটাকে যখন খুঁজে পেলাম ততক্ষণে কটেজটাকে আঁধার তার কালো আলখেল্লা দিয়ে গ্রাস করতে শুরু করেছে।

মোটরবাইক দাঁড় করালাম আমি, আঁকাবাঁকা একটা রাস্তা ধরে এগোলাম। রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা পিরাকান্থা ঝোপের ধারাল কাঁটার খোঁচা লাগল হাতে, জ্যাকেট টেনে ধরতে চাইল। অবশেষে সরু চৌকাঠের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

চলটা ওঠা, রঙ দেওয়া কপাটে আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা দিতেই ঘর থেকে বাঁশির মত তীক্ষ্ণ একটা গলা ভেসে এল। ভিতরে যেতে বলছে আমাকে।

উঁচু পিঠঅলা চেয়ারে বসা রোগা-পাতলা মানুষটিই ফাদার নেসান ডোহেনি হবেন, অনুমান করলাম। ঘাসের চাপড়ার অগ্নিকুণ্ড তাঁর সামনে, শিখাহীন জ্বলছে। মানুষটার মাথার সবগুলো চুল পাকা, বর্ণহীন চোখজোড়া বিষণ্ন, তাতে প্রাণচাঞ্চল্য অনুপস্থিত, গায়ের চামড়া হলদে পার্চমেন্টের মত। সরু, থাবার মত হাত জোড়া কোলের উপর ভাঁজ হয়ে আছে। বয়স নব্বুইয়ের কম হবে না। পরনে কালো, চকচকে সুট, সাদা রোমান কলারটা

খোলা। আগুন জ্বললেও ঘরের মধ্যে গা হিম করা ঠাণ্ডা।

'মৃতরা?' বাঁশির তীক্ষ্ণ সুর বেজে উঠল আবার, আমি আমার আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করার পরে। পাতলা, রক্তশূন্য ঠোঁটজোড়া বেঁকে গেল ওপরের দিকে। সম্ভবত এটা তাঁর হাসি। 'জীবিত মানুষদের মৃতদের সম্পর্কে জানার এত কৌতূহল কেন?'

'ফকলোর মানে লোকাচারবিদ্যার ওপরে টেলিভিশন প্রোগ্রামের জন্যে, ফাদার,' হালকা গলায় বললাম আমি।

'লোকাচারবিদ্যা, অ্যাঁ?' মুরগীর মত কক্কক্ করে উঠলেন তিনি। 'মৃতদের এখন লোকাচারবিদ্যার মধ্যে ঢোকানো হচ্ছে?'

অনেকক্ষণ চুপ হয়ে রইলেন ফাদার। আমি ভাবলাম বুড়ো বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছেন। হঠাৎ মুখ তুলে চাইলেন তিনি আমার দিকে, ঝাড়া দিলেন মাথা।

'আমি আপনাকে মৃতদের অনেক গল্প শোনাতে পারি। তারা জীবিতদের মতই বাস্তব। এখান থেকে অল্পদূরে একটা গোলাবাড়ি আছে। এ অঞ্চলের একটি প্রথা হলো রাতের বেলা পানি ফেলার সময়, এদিকে অনেক বাড়িতেই এখনও কুয়ো থেকে পানি তোলা হয়, যে লোক পানি ফেলবে সে চেঁচিয়ে বলবে, 'টগ ওট আস উয়িশ!' এর মানে হলো পানি থেকে তুমি দূরে থাকো।

'তারা এ কথা কেন বলবে, ফাদার?'

'কারণ লোকের বিশ্বাস পানি লাশের ওপর পড়লে ওটা জ্বলে যাবে পানি পবিত্র বলে। এক রাতে কাছের এক খামার বাড়িতে এক মহিলা এক জগ পানি ফেলার সময় সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে ভুলে গেছে। সাথে সাথে তীব্র একটা আর্তনাদ শুনতে পায় সে। ব্যথায় গোঙাচ্ছে কেউ। অন্ধকারে কাউকে অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না। মাঝরাতে ওই বাড়ির দরজা খুলে যায়, কালো একটি ভেড়া ঢুকে পড়ে ঘরে, তার পিঠে দগদগে ঘা। উনুনের পাশে শুয়ে ওটা যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকে। চাষী এবং তার বউ ভেড়াটাকে নিয়ে কী করবে বুঝে ওঠার আগেই মারা যায় প্রাণীটা।

'চাষী পরদিন সকালে কবর দেয় ভেড়াটাকে। মাঝরাতে আবার তার ঘরের দরজা খুলে যায়, ভেতরে ঢোকে সেই ভেড়া। পিঠে আগের মতই দগদগে ঘা। উনুনের পাশে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মারা যায় ওটা। চাষী আবার তাকে কবর দেয়। কিন্তু তৃতীয়বারও যখন একই ঘটনা ঘটে, চাষী আসে আমার কাছে। তখন আমি বয়সে তরুণ, তবে কী ঘটছে বুঝতে পেরে তক্ষুণি মৃত আত্মার শান্তির উদ্দেশে একটি প্রার্থনা করি। তারপর আর ভেড়াটিকে দেখা যায়নি।'

আমি দ্রুত নোট নিচ্ছিলাম। একটা নোটবুক পাশের টেবিলে রেখেছি। আরেকটা খাতায় ঘটনার বর্ণনা লিখতে লিখতে বললাম, 'দারুণ, ফাদার। এ দিয়ে চমৎকার একটি গল্প হবে।'

ফাদার কটমট করে তাকালেন আমার দিকে। 'আমি আপনার সঙ্গে মশকরা করছি না। জীবিতদের মতই শক্তিধর মৃতেরা। কাজেই এদের নিয়ে ঠাট্টা না করাই ভাল।'

মুচকি হাসলাম আমি। 'আমি ওদের নিয়ে ঠাট্টা করব না, ফাদার। শুধু প্রোগ্রামটা হয়ে গেলেই...'

ফাদার ডোহেনি ঝাঁকি খেলেন একটা, যেন, খুব ব্যথা পেয়েছেন। আমি অবশ্য ব্যাপারটা পাত্তা দিলাম না।

'আয়ারল্যান্ডে জোম্বি বলে সত্যি কি কিছু আছে?'

নাক টানলেন তিনি। সাথে সাথে বইয়ের দোকানের বৃদ্ধার কথা মনে পড়ে গেল। 'মানে যাদু দিয়ে লাশ পুনরুজ্জীবিত করা?'

'জী। আয়াল্যান্ডে জিন্দালাশ নিয়ে কোন গল্প নেই? মার্ভ ভিও যার নাম?

ফাদারের বিষণ্ন চোখ জোড়া জ্বলে উঠল ধক্ করে। 'অবশ্যই মৃতরা চলাফেরা করতে পারে। এ দেশে জীবিত আর মৃতদের মাঝে পাতলা একটা পরদা ছাড়া কিছু নেই। সঠিক সময়ে যথার্থ উদ্দীপনা পেলে মৃতরা আমাদের জগতে ঢুকে পড়তে পারে, যেভাবে আমরা যেতে পারি তাদের দুনিয়ায়।'

আমি আর হাসি থামিয়ে রাখতে পারলাম না। 'রোমের গির্জায় ঠিক এ কথাগুলোই লেখা আছে।'

বিরক্তিতে পাতলা ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে চেপে ধরলেন ফাদার। 'খ্রিস্টান ধর্মের আবির্ভাবের বহু আগে থেকে প্রাচীন মানুষেরা এসব ব্যাপার জানতেন। এটাকে হালকাভাবে নেয়া ঠিক না।' ফাদার নেসান ডোহেনি বক্তা হিসাবে ভালই। আমি দ্রুত তাঁর বাণীর নোট নিয়ে চলেছি। তার অদ্ভুত গল্প দিয়ে ভাল একটা প্রোগ্রাম বানানো যাবে।

'বলে যান, ফাদার,' অনুরোধ করলাম আমি। 'মৃতদের রাজ্যে এই পরদা দিয়ে কীভাবে ঢোকা যাবে বলুন তো?'

'ক্যাহেরবার্নাহেতে তখন ধর্মযাজক আমি। বয়স অল্প। এক মহিলা বাস করত ওখানে। এক রাতে বাড়ি ফিরছে সে, একটা জলধারার পাশে দাঁড়াল। পানি খাবে। আঁজলা ভরে পানি পান করে সিধে হয়েছে মহিলা, কানে ভেসে এল নিচু গলার গান। একদল লোক আসছিল রাস্তা ধরে, অদ্ভুত একটা গান গাইছিল তারা। গা-টা কেমন কেঁপে ওঠে মহিলার। হঠাৎ লক্ষ করে কাছেই দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক তরুণ। দেখছে তাকে। তরুণের চেহারা অদ্ভুত, বিষণ্ন, বড় বড় চোখ জোড়ায় কোন ভাষা ফুটে নেই।

'মহিলা তরুণের পরিচয় জানতে চাইল। মাথা নাড়ল তরুণ। পরিচয় দেবে না। বলল মহিলার সামনে বিরাট বিপদ। সে তরুণের সঙ্গে পালিয়ে না গেলে শয়তান মহিলাকে গ্রাস করবে। মহিলা তরুণের সঙ্গে ছুটতে শুরু করে, তখন রাস্তা ধরে আসা গানের দল "ফিরে এসো!" বলে চেঁচাতে থাকে। কিন্তু ভয়ের চোটে মহিলার পায়ে যেন তখন পাখা গজিয়েছে। সে ছুটতে থাকে তরুণের সঙ্গে। ছুটতে ছুটতে চলে আসে একটি ছোট জঙ্গলের ধারে। দাঁড়িয়ে পড়ে তরুণ। বলে এখন তারা নিরাপদ। তারপর সে মহিলাকে তার মুখের দিকে তাকাতে বলে।

'মহিলা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে তরুণ আর কেউ নয়,

তার বড় ভাই, বছরখানেক আগে যে পানিতে ডুবে মারা গেছিল। লক ডালুয়ার কালো পানিতে সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে যায় সে। তার লাশের আর খোঁজ মেলেনি। তখন মহিলা কী করল? তার মনে হলো শয়তান তার আশপাশেই রয়েছে। আমার কাছে ছুটে এল সে। স্বীকার করল সব। কনফেশনের সময় ভয়ে কাঁপছিল মহিলা। তারপর মারা যায় সে।'

'ভয়ঙ্কর গল্প,' বললাম আমি। এ ঘটনাও উৎসাহের সাথে টুকে নিয়েছি নোটবুকে।

'মৃতদের গল্প এ দেশের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে আছে,' বললেন বৃদ্ধ প্রীস্ট।

ঘরের কোণের দেয়ালে ঝোলানো পুরানো ঘড়ির ঢংঢং শব্দে সচকিত হয়ে উঠলাম। সর্বনাশ! দশটা বেজে গেছে। কিন্তু ফাদার এমন চমৎকার সব গল্প শোনাচ্ছেন, উঠতে ইচ্ছে করল না।

'মার্ভ ভিও'র ব্যাপারটা কী ফাদার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'এদেরকে জিন্দালাশের চেয়েও ভূতুড়ে মনে হলো। এরা কি রিঅ্যানিমেটেড লাশ?'

পাদ্রির চেহারার অভিব্যক্তির পরিবর্তন ঘটল না।

'ভূত হোক আর জিন্দালাশ, মৃত মৃতই–সে যে আকারেই তারা আসুক না কেন।'

'কিন্তু রিঅ্যানিমেটেড মানে পুনরুজ্জীবিত লাশ?' বললাম আমি। 'এদের ব্যাপারটা কী?'

'কথা যদি বলি, বলতেই হবে,' বৃদ্ধ প্রীস্ট কথার অর্ধেকটা যেন নিজেকে শোনালেন, বাকিটুকু আমাকে উদ্দেশ্য করে। 'বলব কী?'

ভাবলাম প্রশ্নটা আমাকেই করা হয়েছে তাই হ্যাঁ সূচক মাথা দোলালাম।

'তা হলে বলি। আপনাকে একটা গল্প শোনাই,' এক ইংরেজ ভূস্বামীর গল্প। ইংল্যান্ডের কাছ থেকে তখনও স্বাধীন হয়নি

আয়ারল্যান্ড। ওই ভূস্বামীর দখলে ছিল এদিককার পাহাড়গুলো।

ঘড়ির দিকে দ্রুত একবার চোখ বোলালাম, 'এটা কি সেই জিন্দা লাশ মার্ভ ভিও'র গল্প?'

আমার কথা না শোনার ভান করলেন প্রীস্ট। 'ইংরেজ লর্ডটির নাম আর্ল অভ মুশেরামোর, লিয়ার এবং লিসনারহারার ব্যারন। বিশাল এক প্রাসাদ ছিল তাঁর, প্রচুর সহায়-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। বেশিরভাগ জমি ছিল বোগেরাগ পর্বতমালাকে ঘিরে। আর্ল অভ মুশেরামোর ছিলেন ধনী এবং প্রভাবশালী।'

বৃদ্ধের কণ্ঠ মৌমাছির গুঞ্জনের মত, সম্মোহক, ঘুম এসে যায় চোখে।

তার গল্পের মূল ঘটনার সময় 'মহা দুর্ভিক্ষ'র কাল। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে আলুর মাঠগুলো ফসলশূন্য হয়ে যায়। ইংরেজ ভূস্বামীরা প্রজাদের খোঁজ-খবর নিতেন না বলে আয়ারল্যান্ডের কৃষকরা প্রচণ্ড দারিদ্র্যের কবলে পড়ে, আলুই তখন প্রধান খাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। তারা লুকিয়ে শিকার করত, মাছ ধরত নদী থেকে। তবে মাছ ধরতে গিয়ে বা শিকার করার সময় ধরা পড়ে গেলে প্রজাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতেন ভূস্বামীরা। একবার এক তরুণ লর্ড মুশেরামোরের এলাকা থেকে খরগোশ শিকারের সাহস দেখায়। তার বিরাট পরিবারটি তখন অনাহারে ধুঁকছে। ধরা পড়ে যায় তরুণ, তাকে অস্ট্রেলিয়ার ভ্যান ডিয়েমেন-এর জমিনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বহু বছরের জন্য। ওই সময় চোরা শিকারীদের এটাই শাস্তি ছিল।

আলুর মাঠগুলো ফসলশূন্য হয়ে পড়লে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়। তিন বছরের মধ্যে দেশের জনসংখ্যা কমে যায় পঁচিশ লাখ। অথচ তখনও ভূস্বামী আর তাদের কর্মচারীরা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করছিল। তাদের ছোট গোয়ালঘরের ভাড়া চাইত। না দিতে পারলে বের করে দিত ঘর থেকে। পুরুষ-নারী-শিশু কারও ক্ষমা ছিল না। ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে বেরিয়ে

পড়তে হত খোলা আকাশের নীচে, তুষারপাতের মধ্যে। আবার যাতে ঘরে ফিরতে না পারে সেজন্য জমিদারের দালালরা কৃষকদের বাড়িঘর ভেঙে টুকরো করে ফেলত। অনাহার, শীতের কামড়সহ নানা অসুখে কৃষকরা মারা যেতে শুরু করে। চারদিকে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ে কলেরা।

ওদিকে ভূস্বামীরা কিন্তু ফুলে উঠছিলেন। তারা আইরিশ জেটিতে জাহাজ বোঝাই করে শস্য, গম, তিসি, গরু-ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন বিক্রির জন্য।

দেশের সর্বত্র একটা তিক্ত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল। শাসককুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠলে সামরিক বাহিনী কঠিন হাতে তা দমন করে।

লর্ড মুশেরামোরের গ্রামের চাষীরা, প্রাসাদের বাইরে সবুজ ঘাস মোড়ানো লনে একদিন এল হাতে হাত ধরে, ভূস্বামীর কাছে সাহায্য চাইতে। আসন্ন শীতে যেন বেঁচে থাকতে পারে, তারই ব্যাকুল প্রার্থনা। কারণ ইতোমধ্যে অনেকেই না খেয়ে মারা গেছে। শীত শুরু হয়ে গেলে, উপযুক্ত সাহায্য না পেলে হয়তো কেউই বাঁচবে না।

লর্ড মুশেরামোরের জমিদারির প্রতি তেমন নজর ছিল না। ত্রিশ বছরের এই যুবক জমিদার হবার পরে মাত্র একবার তার জমিদারি দর্শন করেছেন। লন্ডনে বাস করতেই পছন্দ করেন তিনি, ভালবাসেন মদ আর জুয়ো নিয়ে থাকতে। তবে এবার তিনি গ্রামে এসেছেন দেখতে 'দুর্ভিক্ষ'র কারণে যেন তাঁর জমির উৎপাদন কোন রকম ব্যাহত না হয়।

লনে লোকের ভিড় দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন লর্ড মুশেরামোর। মানুষের সংখ্যা কয়েকশো হবে। এরা সবাই এসেছে গ্রাম থেকে। জমিদার তাঁর নায়েবকে সোজা পাঠিয়ে দিলেন ম্যালোতে, সেনাবাহিনীকে খবর দিতে। তিন প্লাটুন অশ্বারোহী সৈন্য চলে এল সাথে সাথে। চাষারা হামলা করে

বসতে পারে এই ভয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল প্রাসাদ। দলের ক্যাপ্টেন লর্ড মুশেরামোরের কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলল, কৃষকদেরকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। তারা ইতস্তত করছে দেখে ক্যাপ্টেন তার সেনাবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রামবাসীর উপর। যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল অশ্বারোহী সৈন্যরা। তরোয়াল দিয়ে ইচ্ছেমত কুপিয়ে চলল অসহায় লোকগুলোকে। ঘটনাস্থলেই মারা গেল অনেকে। এদের মধ্যে স্থানীয় প্রীস্টও ছিল। সে এসেছিল কৃষকদের পক্ষে জমিদারের সঙ্গে কথা বলতে।

গ্রামবাসীদের মাঝে ব্রিড কাপিন নামে এক বৃদ্ধাও ছিল। যখন দুর্ভিক্ষের শুরু হয়নি, সেই সময় থেকেই লোকে সভয়ে এড়িয়ে চলত তাকে ডাইনি ভেবে। বুড়ি পালিয়ে বাঁচল। শুধু তরবারির আঘাতে তার থুতনির অনেকটা কেটে গিয়েছিল। তবে আঘাতটা বেশি লেগেছিল বুকে। জমিদারের কাছ থেকে এরকম আচরণ মোটেই আশা করেনি সে।

ব্রিড কাপিন পালিয়ে গেল পাহাড়ে। গুহার মধ্যে সারাদিন লুকিয়ে রইল। রাতের বেলা গুহা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। চলে এল জমিদারের লনে। ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চাষাভুসোদের লাশ। বুড়ি পাগলের মত লাশের মধ্যে কী যেন খুঁজছিল। অবশেষে পেয়ে গেল কাঙ্ক্ষিত জিনিস। একটা লাশ। তবে লাশটার গায়ে আঘাতের চিহ্ন কম। মারাত্মক ভাবে কেটে-ছিঁড়ে যায়নি তার কোন অঙ্গ। বুড়ির গায়ে কোত্থেকে আসুরিক শক্তি ভর করল কে জানে, হয়তো ঈশ্বর কিংবা শয়তান যুগিয়েছে, সে লাশটাকে টেনে নিয়ে চলল রাতের আঁধারে। হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে এল পাহাড়ের সেই গুহায়।

গুহার মধ্যে বসে বহু প্রাচীন নানা মন্ত্র পড়া শুরু করে দিল বৃদ্ধা। সেই অদ্ভুত মন্ত্র বুঝবার সাধ্য কোন গেইলিক পণ্ডিতেরও নেই। ঝোপঝাড় খুঁজে কিছু ভেষজ লতাপাতা নিয়ে এল সে, আগুন জ্বালাল। কেতলিতে পানি ভরে তাতে ছুঁড়ে দিল

লতাপাতা। তারপর চুলোয় বসিয়ে দিল কেতলি। কিছুক্ষণ পরে কেতলির পানি দিয়ে গোসল করাল লাশটাকে। অবশেষে চাঁদ যখন আলো ছড়াতে উঁকি দিল মাঝ আকাশে, ঘোষণা করল মধ্য রাতের, ওই সময় লোকটার শরীর কাঁপতে শুরু করল, স্পন্দন জাগল নাড়িতে, চোখ মেলে চাইল সে।

বুড়ি ব্রিড কাপিন চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে।

সে মার্ভ ভিও সৃষ্টি করেছে, তার আহ্বানে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে লাশ। প্রাচীনকালে বলা হত কোন অখ্রিস্টান পুরোহিত যদি অপঘাতে মরে যাওয়া কোন ব্যক্তির লাশের গায়ে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারে তবে যে লোক অন্যায়ভাবে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করেছে তার উপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। আর বৃদ্ধা তখন প্রতিহিংসার আগুনে দাউদাউ জ্বলছে। সে জিন্দালাশকে পাঠিয়ে দিল প্রতিশোধ নিতে।

লর্ড মুশেরামোর এক সন্ধ্যায় কর্কের জেটিতে এসেছেন ইংল্যান্ডগামী জাহাজে উঠতে, অতর্কিত হামলা হলো তাঁর উপর। আক্ষরিক অর্থেই তাঁকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলল হামলাকারী। তবে কেউ চিনতে পারেনি ঘাতককে। পুলিশ এবং সৈন্যরা শপথ করে বলল, তারা হত্যাকারীকে বেশ কয়েকবার গুলি করেছে। তবে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। পুলিশ আর সৈন্যরা যদি হামলাকারীর গায়ে গুলি লাগিয়েই থাকে তা হলে জেটিতে রক্তের চিহ্ন কই? ওখানটা শুধু লর্ড মুশেরামোর তাজা রক্তে মাখামাখি ছিল, হত্যাকারী যেন মিলিয়ে গেছে বাতাসে।

এরপরে হামলার শিকার হলো সেই অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেন। ম্যালোতে নিজের নিরাপদ ব্যারাকে। তাকেও ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলা হয়েছে। হামলাকারী নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড শক্তিধর এবং হত্যার নেশায় উন্মত্ত। নইলে ব্যারাকের পাথর আর লোহার দেয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকতে যেত না। ক্যাপ্টেনের ছিন্নভিন্ন লাশ দেখে ভারত ও আফ্রিকায় কাজ করা অনেক অভিজ্ঞ সৈনিকই

ঘটনাস্থলে অসুস্থ ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

এ ঘটনার কয়েকদিন পরে, লর্ড মুশেরামোরের নায়েব মেজর ফারান তার বিশাল দুই হাউন্ড নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় হাঁটাহাঁটি করতে বেরোয়। ফারান দীর্ঘদেহী, গাট্টাগোট্টা, পৃথিবীর কোনকিছুতে তার ভয় নেই। সঙ্গে একজোড়া পিস্তল সবসময়েই থাকে। আর শিকারী কুকুর দুটো শুধু সঙ্গ দেওয়ার জন্য মনিবের সাথে থাকে না। হুকুম পাওয়ামাত্র চোখের পলকে যে কাউকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে ওস্তাদ তারা। মেজর ফারানকে মুশেরামোরের কৃষক সম্প্রদায় সবচে' বেশি ঘৃণা করত। আর কথাটা জানত বলেই সে জমিদারিতে টহল দেওয়ার নাম করে ভয় ছড়াতে পছন্দও করত। যদিও কারও অতর্কিত হামলার অসহায় শিকার হতে চায় না বলে সতর্কতা অবলম্বন করে চলত মেজর ফারান।

কিন্তু পিস্তল বা হাউন্ড কেউ তাকে বাঁচাতে পারল না সেই সন্ধ্যায়। তিন দিন বাদে মেজর ফারানের রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন লাশ পাওয়া গেল রাস্তার ধারে। ডাক্তার স্বীকার করলেন তিনি টুকরো হয়ে যাওয়া হাউন্ডগুলোর মাংস থেকে ফারানের লাশের শত টুকরো মাংস আলাদা করতে পারেননি। বুঝতেই পারেননি কোন্‌টা কুকুর, কোন্‌টা মানুষ।

এ সমস্ত ঘটনা যখন ঘটছে ওই সময় বুড়ি ব্রিড কাপিন পাহাড়ের ঢালে, তার গুহার আস্তানায় অসন্তোষে গোঙাচ্ছে।

মুশেরামোরের জমিদারিতে যাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে, সেই হত্যাকারীদের ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটিয়েও সন্তুষ্ট হতে পারছিল না সে। বৃদ্ধা প্রতিজ্ঞা করেছিল তার আত্মীয় এবং গ্রামের স্বজনদেরকে কেড়ে নেওয়ার অপরাধে সে মুশেরামোর পরিবারের কাউকে ছাড়বে না, প্রত্যেককে এ জন্য মাশুল দিতে হবে। প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছিল সে। আর প্রতিশোধ নেওয়ার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত মার্ভ ভিওকে।

শোনা যায়, বছরের পর বছর ব্রিড কাপিন রাতের বেলা বোগেরাগ পর্বতমালার গ্রাম চষে বেরিয়েছে প্রতিহিংসায়, সঙ্গে ছিল সেই জিন্দালাশ।

হঠাৎ করেই চুপ হয়ে গেলেন ফাদার ডোহেনি। আমি হাঁ করে তাঁর গল্প শুনছিলাম আসনের একেবারে কিনারে বসে।

'দারুণ গল্প, ফাদার,' অবশেষে বিড়বিড় করলাম আমি গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে বুঝতে পেরে। 'লর্ড মুশেরামোর বলে সত্যি কেউ ছিলেন?'

জবাব দিলেন না বৃদ্ধ, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ধূমায়িত ঘাসের চাপড়ার দিকে। আমি মৃদু কেঁপে উঠলাম শীতে। চাপড়াটা খামোকাই জ্বলছে। ঘরের ঠাণ্ডা একরত্তি দূর করতে পারেনি।

'আপনি কি কর্কে, আমাদের স্টুডিওতে একবার আসবেন?' অনুরোধ করলাম আমি। 'মার্ভ ভিও'র ব্যাপারে টিভি প্রোগ্রামে একটু বলতেন। বিনিময়ে কিছু সম্মানী অবশ্যই পাবেন।'

হঠাৎ দমকা একটা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতে পেছন ফিরে চাইলাম।

কটেজের দরজা খোলা। অবাক হয়ে দেখলাম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বইয়ের দোকানের সেই বৃদ্ধা। তার ভিক্টোরিয়ান পোশাক পতাকার মত উড়ছে পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে, যেন কালো দাঁড়কাকের ডানা।

'তোমার কাজ নিশ্চই শেষ হয়েছে,' শত বর্ষের পুরানো গলা খন্‌খন্‌ করে উঠল কর্তৃত্বের সুরে।

'আমি ফাদার ডোহেনির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' বৃদ্ধ প্রীস্টের দিকে ফিরলাম সমর্থনের আশায়। 'অবশ্য আপনার পরামর্শেই,' বিনয়ের সুরে যোগ করলাম শেষ কথাটা।

বৃদ্ধ সম্ভবত সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন, তার থুতনি এসে ঠেকেছে বুকে, চোখ বোজা।

'বেশ। দেখা হয়েছে। কথাও বলেছ। এখন ভাগো!'

বৃদ্ধার অভদ্র আচরণে বিরক্ত হয়ে কটমট করে তাকালাম তার দিকে।

'অন্যের বাড়িতে এসে আমাকে দয়া করে উপদেশ দেবেন না, ম্যাডাম।' কঠিন গলা আমার।

কালো ঘোমটার আড়ালে মুখ হাঁ করল বুড়ি, মৃগী রোগীর মত এমন বিকট গলায় হেসে উঠল, ঘাড়ের পেছনের সব ক'টা চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল আমার।

'এখানকার দায়িত্বে আছি আমি,' ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলল সে।

'আপনি ফাদার ডোহেনির হাউজকীপার?' অবাক ভাবটা গোপন রাখতে পারলাম না। চুলো থেকে টেবিলে চায়ের কেতলি এ মহিলা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ, এমনই রোগা-পাতলা সে। এ কী ভাবে হাউজকীপারের দায়িত্ব পালন করবে!

আবার খলখল হাসির শব্দ শোনা গেল।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, খোকা,' অবশেষে বলল বুড়ি। 'তোমার ব্যাপারে নাক গলাতেই হচ্ছে। রাতের বেলা একটা শয়তান আসে এ পাহাড়ে। ওটার কথা ভাবতে হয় আমাকে।'

ঝট করে থাবার মত একটা হাত ছুঁড়ল সে বাইরের দিকে ইঙ্গিত করে। তার মানে এখন কেটে পড়ো।

আমি আবার তাকালাম ফাদার ডোহেনির দিকে। কিন্তু লোকটার চেহারায় কোন ভাব ফুটে নেই। অগত্যা নোটবুক গুছিয়ে, পকেটে পুরে সিধে হলাম আমি।

বৃদ্ধাকে 'শুভ রাত্রি' বললেও সে না শুনবার ভান করে দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল আমাকে যেতে দেওয়ার জন্য।

কটেজের বাইরে, চাঁদ উঠেছে আকাশে। মেঘেরা ছোটাছুটি করছে। বাতাস আর্তনাদ তুলছে পাথরে বাড়ি খেয়ে। সাদা পরদা নিয়ে নামতে শুরু করেছে কুয়াশা। তাপমাত্রা পড়ে গেছে অনেক।

এখানে আসবার সময় এতটা শীত লাগেনি। দূর থেকে ভেসে এল কুকুরের ডাক। রাতের বাতাসে অপার্থিব এবং অবাস্তব লাগল ডাকটাকে।

মোটর সাইকেলে চড়ে বসলাম আমি। কয়েক মুহূর্ত লাগল ট্রায়াম্ফের ইঞ্জিন চালু হতে। পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে নেমে আসতে থাকলাম। মাইলখানেক পথ এগিয়েছি, হঠাৎ মনে পড়ল, আরি! ফাদার ডোহেনি'র কুটিরের ছোট টেবিলটার উপর একটা নোটবুক ফেলে এসেছি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে থেমে পড়লাম। ট্রায়াম্ফকে ঘুরিয়ে নিলাম, মেঠো রাস্তা ধরে আবার ফিরে চললাম 'টিচ ড্রচ চু'র দিকে।

কুটির থেকে কিছু দূরে থামালাম বাইক, হেঁটে এগোলাম বাড়িটার কালো কাঠামোর দিকে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো দোরগোড়ায়।

তীক্ষ্ণ মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ ঢুকেছে কানে।

সেই বৃদ্ধার কণ্ঠ। কিন্তু শব্দগুলোর মাথামুণ্ডু অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে হলো প্রাচীন আইরিশ শব্দে মন্ত্র পড়ছে বুড়ি। ভীষণ ইচ্ছে হলো জানালার শার্সির কাঁচ দিয়ে ভিতরে তাকাতে।

সেই বৃদ্ধ প্রীস্ট ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধা তার সামনে, কাঁধ কুঁজো করে বিলাপের সুরে মন্ত্রোচ্চারণ করছে। অবাক হয়ে দেখলাম বুড়ির হাতে পুরানো দিনের অশ্বারোহী বাহিনীর তরবারি, ফলাটা বাঁকা। তীক্ষ্ণ খনখনে কণ্ঠে তার মন্ত্র পড়া, যেভাবে তরবারিটা ধরে রেখেছে হাতে, সবকিছুর মধ্যে কেমন অদ্ভুত এবং অশুভ একটা ব্যাপার আছে বলে মনে হলো।

আচমকা থেমে গেল সে।

'মনে করো, ডোহেনি,' হুকুম করল বৃদ্ধা।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন বুড়ো প্রীস্ট, বর্ণহীন চোখ জোড়ার বিস্ফারিত দৃষ্টি বুড়ির উপর।

'তোমাকে মনে করতেই হবে। ওরা এই করেছিল।'

আমি সাবধান করে দেওয়ার আগেই বৃদ্ধা হাতের তরবারিটা মাথার উপরে তুলল, তারপর হাড় জিরজিরে শরীরের পূর্ণ শক্তি দিয়ে অস্ত্রের ডগার পুরোটা ঢুকিয়ে দিল প্রীস্টের হৃদপিণ্ড বরাবর। সম্পূর্ণ ফলাটা পড়পড় করে ঢুকে গেল বুড়োর বুকে, পিঠ ঠেলে বেরিয়ে এল। আশ্চর্য, তারপরও তিনি স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন! মুখ হাঁ হয়ে গেল আমার। ভয় আর বিস্ময়ে মুখের কথা হারিয়ে ফেলেছি আমি।

তবে আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখবার বাকি ছিল তখনও। বৃদ্ধা ছেড়ে দিল তরবারি, সরে দাঁড়াল প্রীস্টের কাছ থেকে। 'মনে করো, ডোহেনি!'

বৃদ্ধের থাবার মত হাত চেপে ধরল তরবারির হাতল, প্রচণ্ড এক টানে ফলাটা বের করে আনল সে শরীরের ভিতর থেকে। ফলা ঝলমল করছে আগুনের আলোয়, এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন নেই ওতে।

আমি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে জমে গেলাম আতঙ্কে।

যা দেখেছি বিশ্বাস করতে পারছি না। এ অসম্ভব। বুড়ি প্রীস্টের শরীরে ধারাল তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল অথচ বুড়োর চোখের পাতা কাঁপল না পর্যন্ত। প্রীস্ট ওটা শরীরের ভিতর থেকে টেনে বের করে আনলেন। শরীরে কোন ক্ষত চিহ্নও নেই! 'মনে করো, ডোহেনি!'

আমি ভয়ার্ত একটা আর্তনাদ করেই ঘুরে দাঁড়ালাম, ছুটলাম বাইক লক্ষ্য করে। আতঙ্কে অবশ হয়ে গেছে শরীর। মনে হলো পা চলছে না। মোটর স্টার্ট দিচ্ছি, ঠিক ভাবে স্টার্ট হচ্ছে না। বুড়ির চিৎকার শুনতে পেলাম, রাস্তায় কার যেন ছায়া পড়েছে। আসছে এদিকে। ঘাড়ের কাছে বিকট গন্ধ নিয়ে ঝাপটা মারল বাতাস। এমন সময় গর্জন ছেড়ে চালু হয়ে গেল বাইক, ঝড়ের বেগে ছুটলাম আমি। রাস্তাটা আঁকাবাঁকা এবং এবড়োখেবড়ো।

পিচ্ছিল কাদায় তেমন গতি তুলতে পারছি না। আমি যেন বাইক-রেস করছি, ঝাঁকি খেয়ে, লাফিয়ে পার হচ্ছি খানা-খন্দ। বেলিনগিরি নামে একটা গ্রাম আছে কাছে। ছুটছি ওদিকেই। জীবনেও এত জোরে বাইক চালাইনি, যেন কয়েকশো পিশাচ তাড়া করেছে আমাকে।

সবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি, চোখে পড়ল পাহাড়ি, তীব্র খরস্রোতা একটা নদীর উপর পিঠ কুঁজো একটা ছোট সেতু। গ্রানিট পাথরের সেতুটা চওড়ায় এত কম যে পাশাপাশি তিনজন মানুষও হেঁটে আসতে পারবে না। সেতুটার উপর উঠে পড়ব কিনা ভাবছি। এমন সময়…

বাইকের সামনের আলোয় দেখলাম সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ প্রীস্ট; অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

ভয়ের চোটে বাইকের হ্যান্ডলবার চেপে ধরলাম, মোচড় দিলাম জোরে, সেতুতে উঠবার বদলে অগভীর স্রোত পার হবার ঝুঁকি নেওয়াটা নিরাপদ ঠেকল আমার কাছে।

বাইকের সামনের চাকা বাড়ি খেল পাথরের গায়ে, পরমুহূর্তে ছিটকে গেলাম আমি। দড়াম করে আছড়ে পড়লাম কর্দমাক্ত নদীর তীরে। ব্যথায় ফুসফুসের সমস্ত শ্বাস বেরিয়ে গেল আমার। জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। বোধহয় কয়েক মুহূর্ত জ্ঞান ছিল না আমার। চেতনা ফিরে পেলাম বমি বমি একটা ভাব নিয়ে। চোখ পিটপিট করে তাকালাম।

আমার মুখের কাছ থেকে ফুটখানেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে প্রীস্ট। বর্ণহীন চোখজোড়া যেন কটমট করে চেয়ে আছে আমার দিকেই। ফোঁসফোঁস দুর্গন্ধময় নিশ্বাস ফেলছে সে। তাকে ঘিরে আছে যেন মৃত্যুর বিকট গন্ধ। আমার দিকে ঝুঁকল সে, লম্বা, নখঅলা হাতজোড়া বাড়িয়ে দিল। শক্তিশালী থাবায় চেপে ধরল গলা। 'থামো, ডোহেনি!'

বৃদ্ধার খনখনে সেই কণ্ঠ। প্রীস্টের কাঁধের উপর দিয়ে এক

ঝলক দেখতে পেলাম তাকে। ঘোমটা নেই, নরকঙ্কালের মত ভয়ঙ্কর মুখ, গাল থেকে কপাল পর্যন্ত একটা লম্বা ক্ষত, তাকিয়ে আছে বিজয় উল্লাস চোখে নিয়ে। গলার চাপ একটু কমল।

'ও ওদের কেউ নয়, ডোহেনি। ওকে ছেড়ে দাও। আমরা যা করেছি তা সবই দেখেছে ও। সবই ওর মনে থাকবে। সবাইকে ও জানিয়েও দেবে। আর সেটাই আমি চাই। ওকে ছেড়ে দাও। চলে যাক ও।'

অবিশ্বাস্য শক্তিধর বৃদ্ধ প্রীস্ট আমাকে ধরে এমন জোরে ঝাঁকি মারল যেন আমি একটা ভাঙা পুতুল।

'ছেড়ে দাও ওকে।' আবার আদেশ এল।

এরপরে আমার আর কিছু মনে নেই।

কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম জানি না। চেতনা ফিরে পেয়ে দেখি কেউ নেই ওখানে। আমি ফুলে ওঠা কপালে আলতো করে হাত বুলালাম, টলতে টলতে সিধে হলাম। প্রথমে দু'এক মুহূর্ত মনে করতে পারিনি পাহাড়ি নদীর ধারে চিৎ হয়ে পড়েছিলাম কেন। পরে মনে পড়ে গেল সব। চারদিকে চোখ বুলালাম। বৃদ্ধ প্রীস্ট বা মহিলার চিহ্নও নেই কোথাও। পাহাড় আঁধারে ঢাকা। শুধু গাছের পাতার সরসর আর পাহাড় থেকে ছুটে আসা বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

শক্তি ফিরে পেতে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমার ট্রায়াম্ফ বাইকটিকে চোখে পড়ল। জলের মধ্যে পড়ে আছে। ওটাকে তুলতে গিয়ে দেখি চাকার অনেকগুলো স্পোক ছুটে গেছে। স্টার্ট দিলেও কাজ হবে না। তবু স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করলাম। দুর্বল 'ফুট' শব্দ করে ওটা নীরব হয়ে গেল। ইঞ্জিনে পানি ঢুকে গেছে। এ আর চলবে না।

বাইকটিকে নদীর তীরে তুলে নিয়ে এলাম। তারপর এগোলাম সেতুর দিকে। বালিনাগ্রিতে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমার মাথা দপ্ দপ্ করছে ব্যথায়, চিন্তাভাবনাগুলো

কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি যা দেখেছি তা কি সত্যি? কেউ কি অমন ভয়ঙ্কর হতে পারে? নাকি ওসব দৃষ্টিভ্রম ছিল?

ঝাড়া তিনঘণ্টা মেঠো রাস্তা দিয়ে হাঁটবার পরে সভ্যতার চিহ্ন মিলল।

গ্যারেজের আবছা কাঠামোটা ফুটে উঠল অন্ধকার ভেদ করে। এখান থেকে পেট্রল নিয়েছি আমি। টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম ওটার দিকে, শীতে হি হি করে কাঁপছি। দরজায় কড়া নাড়লাম। কয়েক মুহূর্ত পরে গ্যারেজের সামনের ঘরের জানালা খোলার শব্দ পেলাম। ভেসে এল আলোক রেখা, সেই সাথে মানুষের গলা, 'কে ওখানে?'

'আমার মোটর বাইক নষ্ট হয়ে- গেছে। আমি খুব বিপদের মধ্যে আছি,' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'এখানে কোন ট্যাক্সি মিলবে কিংবা রাতটা থাকার জন্যে আশ্রয়?'

'এখন রাত তিনটা বাজে সে খেয়াল আছে?' কঠিন গলায় বলল লোকটি।

'আমি মুশেরামোর পাহাড় বয়ে এসেছি, ভাই। আমাকে একটু আশ্রয় দিন।' অনুনয় করলাম আমি।

সজোরে জানালা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলাম। আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অবশেষে নীচের জানালায় আলো দেখা গেল। তারপর খুলে গেল দরজা।

'ভেতরে আসুন।' বলল পুরুষ কণ্ঠ।

ঘরে ঢুকলাম। তীব্র ঠাণ্ডা আর কিছুক্ষণ আগের ঘটে যাওয়া ঘটনা আমাকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। আমার উপর লণ্ঠনের আলো ফেলল লোকটি। চিনে ফেলল। 'আপনিই না আজ সন্ধ্যায় "টিচ ড্রচ চু"র ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন আমার কাছে?'

মাথা ঝাঁকালাম। এ লোকই সন্ধ্যাবেলায় আমাকে পেট্রল দিয়েছে। তার ওভারঅলের উপর নাম লেখা ছিল 'মানুস'।

'ঠিক বলেছেন। আমার মোটর বাইক নষ্ট হয়ে গেছে। একটা

ক্যাব দরকার।'

হতবুদ্ধি ভঙ্গিতে ডানে-বামে মাথা নাড়ল সে।

'আপনাকে খুব পরিশ্রান্ত লাগছে।' কাবার্ড থেকে এক বোতল জেমিসন আর একটা গ্লাস নিয়ে এল সে। 'এটা খেলে একটু চাঙা হয়ে উঠবেন।' হুইস্কি ঢেলে গ্লাসটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

'এত রাতে "টিচ ড্রচ চু"তে কী করছিলেন? আপনি ভূতের ওঝা নাকি?' জবাবের অপেক্ষা না করে সে বলতে লাগল, 'আমি ম্যাক্রুমে ফোন করে দিচ্ছি। ট্যাক্সি চলে আসবে। কোথায় যাবেন?'

'কর্ক সিটিতে।'

'বাইক নষ্ট হয়েছে কোথায়?'

'পাহাড়ের কাছে, একটা নদীর ধারে। নদীর ওপর সেতু আছে।'

'জায়গাটা চিনি আমি। কাল সকালে আপনার বাইক নিয়ে আসব। আপনার যোগাযোগের নাম্বারটা দিন। বাইকের কী ক্ষতি হয়েছে ফোনে জানিয়ে দেব।'

আমি মাথা দোলালাম। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ভুরু কুঁচকে তাকালাম তার দিকে।

'আমি ভূতের ওঝা কিনা জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

'আপনি যে "টিচ ড্রচ চু"র খবর জানতে চাইলেন। স্থানীয়রা ও নামেই ডাকে ও বাড়িকে। বাড়িটির পৈশাচিক কুখ্যাতি রয়েছে। অনেকেই বলে ওটা ভূতুড়ে বাড়ি। দুর্ভিক্ষের সময়ে যে ক'টা কটেজ টিকে ছিল ওটা তার একটা।' অবিশ্বাসে মাথা নাড়লাম আমি, চুমুক দিলাম হুইস্কিতে। ঠাণ্ডা শরীরে তরল আগুনটা বেশ উষ্ণতা জোগাচ্ছে। 'আমি ফাদার নেসান ডোহেনিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম,' ব্যাখ্যা করলাম।

অবাক চোখে তাকাল লোকটি আমার দিকে, তারপর হেসে উঠল চাপা গলায়।

'তা হলে আমি ঠিকই ধরেছি, কী বলেন? নিশ্চয়ই তার খোঁজ

পাননি?'

গরম হওয়ার জন্য দু'হাতের তালু ঘষছিলাম। থেমে গেলাম। অবাক গলায় প্রশ্ন করলাম, 'মানে?'

'মানে ফাদার নেসান ডোহেনি একশো ষাট বছর আগে মারা গেছেন।'

বরফ জলের একটা স্রোত নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।

'একশো ষাট বছর আগে মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ। কেন আপনি জানেন না গল্পটা? দুর্ভিক্ষের সময় তিনি লোকজন নিয়ে মুশেরামোর প্রাসাদে গিয়েছিলেন লর্ড মুশেরামোরের কাছে গ্রামের চাষাদের জন্যে সাহায্য চাইতে, তাদেরকে যেন গৃহহীন হতে না হয় সে ব্যাপারে অনুরোধ করতে। লর্ড মুশেরামোর ম্যালো থেকে সৈন্য ডেকে পাঠান এবং প্রাসাদের লনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা লোকগুলোর ওপর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। ফাদার নেসান ডোহেনি তাঁর সঙ্গীদের সহ তরবারির আঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন।'

জোরে ঢোক গিললাম আমি।

'আর…আর ব্রিড কাপিনের কী হয়েছিল?'

লোকটি এবার গলা ছেড়ে হাসল।

'আপনি তা হলে পুরানো কিংবদন্তীর খবরও জানেন! অবশ্য জানারই কথা। স্থানীয়রা বলে "টিচ ড্রচ চু" ছিল ওই বৃদ্ধার পুরানো কুটির। সবই অবশ্য কিংবদন্তীর অংশ। আমার অন্তত তাই মনে হয়। কিংবদন্তী ছাড়া কিছু নয়। বেচারা ফাদার ডোহেনি আর ডাইনি ব্রিড কাপিন মারা গেছে বহু আগে। যদিও শোনা যায়, এক বুড়ি এক প্রীস্টের লাশকে নাকি আবার বাঁচিয়ে তুলেছিল লর্ড মুশেরামোর আর তার বংশকে নির্বংশ করার প্রতিশোধের নেশায়। ঈশ্বর রক্ষা করুন আমাদেরকে!' সে ক্রুশ আঁকল বুকে। 'এ আসলে কিংবদন্তী ছাড়া অন্য কিছু নয়।'

মূল গল্প: পিটার ট্রিমেনের 'মার্ভ ভিও'

হলদে পা

পাহাড়ে বসন্ত নেমেছে–ঝলমলে সূর্যের আলো, টলটলে নীল আকাশ আর মাঠগুলোয় যেন ফলে আছে সোনা–যেদিকে তাকাও শুধু হলদে সর্ষে। এক ঝলক বাতাসে নড়ে উঠল গম গাছের মাথা, গরবাল রাইফেলসের ভবন সিং-এর বুকেও দোলা দিল খুশির হাওয়া। সে বাড়ি এসেছে। ফ্রান্সের যুদ্ধ ক্ষেত্র, যেখানকার ট্রেঞ্চগুলোতে শুধু মৃত্যু আর পচা লাশের গন্ধ এবং যে জায়গায় করডাইট আর মাস্টার্ড গ্যাসের ঘন কুয়াশার আবরণ ঠেলে কখনোই উঁকি দিতে পারে না সূর্য রশ্মি, সে-ই নরক থেকে আজ সে অনেক দূরে।

সালটা ১৯১৮। মধ্য হিমালয়ের গরবাল ফ্রান্স থেকে হাজারো মাইল দূরে। তবে ভবন সিংয়ের মনে হচ্ছে সে যেন মাত্র কিছুদিন আগে বাড়ি ছেড়েছিল। তিন বছরেরও বেশি সময় তাকে পড়ে থাকতে হয়েছে বিদেশের মাটিতে, দেশের খবর প্রায় পেতই না বলা চলে। এ মুহূর্তে নিজের গ্রামের দিকে চলে যাওয়া সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তায় লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুতে এগুতে শুধু খাবারের কথা মনে পড়ছে ভবন সিঙের। ঘরে তৈরি মাখন দিয়ে মার হাতের ভাজা ভুট্টার বাদামী রুটি আর হালুয়ার কথা ভাবতেই জিভে জল এসে গেল তার। সবশেষে এক গ্লাস টাটকা ঘোল। আহ, এরচে' মজার খাবার আর কী হতে পারে!

কোটদুয়ারের রেলওয়ের শেষ প্রান্ত থেকে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করেছিল ভবন সিং। আশা করছে সূর্য অস্ত যাবার আগেই পৌঁছে যাবে গ্রামে। কিন্তু বিনা নোটিশে হঠাৎ কালো হয়ে গেল আকাশ,

শোঁ শোঁ আওয়াজে বইতে লাগল বাতাস। শুরু হয়ে গেছে ঝড়। সেই সাথে শিলা বৃষ্টি। একটা প্রকাণ্ড ওক গাছের নীচে আশ্রয় নিল ভবন সিং। ঝড় থামবার অপেক্ষায় বসে রইল। আর ভাবতে লাগল মা'র হাতের রান্নার কথা।

যুদ্ধের কথাও মনে পড়ছে ভবন সিঙের। এই অনর্থক লড়াইয়ের কোন মানে খুঁজে পায় না সে। সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয়েছিল তাকে কর্তব্যের তাগিদে এবং পারিবারিক সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে। তার বাবাও একই রেজিমেন্টের সদস্য ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হবার পরে, বাবা এমন কয়েকটি জায়গার নাম বলেছিলেন যেগুলোর নামও জীবনে শোনেনি ভবন সিং, সেখানে নাকি তার বাপকে যেতে হয়েছিল ব্রিটিশ প্রভুদের সাহায্য করতে। ভবন সিং তাদের প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামে কখনও সাদা চামড়ার মানুষ দেখেনি। তবে ট্রেঞ্চে এদের সঙ্গে খাতির হয়ে যায় তার। ওরা ভবন সিংঙের মতই। নিজেদেরকে তারা ঠাট্টা করে 'কামানের খাবার' বলত।

হঠাৎ করে হামলে পড়া ঝড় আকস্মিকভাবেই থেমে গেল। ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিল ভবন সিং। রওনা হয়ে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে ভেসে আসা পাখির গানে ঠোঁটে শিস এসে গেল তার। অনেক দিন সে গান-টান করে না, তাই সুরটা ঠিক জমল না। রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভবন সিংঙের মনে হলো কোথাও কিছু একটা ভজকট হয়ে গেছে; কীসের যেন অভাব অনুভব করছে সে।

দাঁড়িয়ে পড়ল ভবন সিং। চোখ বুলাল চারপাশে। তার চাচার গ্রাম এখান থেকে কয়েক মিনিটের পথ। কিন্তু কোন রাখালকে গরু-ছাগলের পাল নিয়ে বাড়ি ফিরতে দেখা যাচ্ছে না। কারও বাড়ির উঠানের চুল্লিতে আগুনও জ্বলছে না।

ভবন সিঙের মনে হলো ভার্দুনের এ গ্রামটি যেন যুদ্ধের কারণে ধ্বংস এবং জনশূন্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাড়িঘরগুলো তো বহাল

তবিয়তেই রয়েছে। অথচ একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না। ব্যাপারটা অবাক করে তুলল তাকে।

নীরব, শূন্য গ্রামে বুটের শব্দ তুলে ঢুকল ভবন সিং। চলে এল চাচার বাড়ির সামনে। ঘরের দরজা ভেজানো। ভিতরে ঢুকল সে। সব কিছু ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে, শুধু কেউ নেই। গোটা পরিবার কি মাঠে গেছে? কিন্তু তা সম্ভব নয়, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ভবন সিং, তার দাদু বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। মানে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় চলৎশক্তিহীন অশীতিপর বৃদ্ধের। তাঁর বাড়িতে থেকে বাচ্চাদের দেখাশোনা করবার কথা। কিন্তু ঘরে কোন বাচ্চা নেই, দাদুও নেই।

ভবন সিং জানে না যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে গরবাল হিমালয়ে এ বছর। বিউবোনিক প্লেগে গ্রামের পর গ্রাম সাফ হয়ে গেছে, একটি প্রাণীও বেঁচে নেই। যে মাঠে সে হলদে সর্ষের খেত দেখে এসেছে তার বীজ রোপণ করা হয়েছিল মহামারীর আগে। সর্ষে তুলবার সময় হয়েছে, কিন্তু এ কাজ করবার মত কেউ নেই। ভয়ঙ্কর রোগটার হাত থেকে যারা রক্ষা পেয়েছে তারা তাদের পাহাড়ের বাড়ি ছেড়ে সমতল ভূমিতে পালিয়েছে।

সাঁঝ নেমে গেছে। ভবন সিং উঠানে এসে দাঁড়াল। কী করবে ভাবছে। তার নিজের বাড়ি পাহাড়ের ঢালটার ঠিক ওপাড়ে। ওদিকেই পা বাড়াল সে। আশা করল নিজের গ্রামে সবাইকে পাবে।

ঢালের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামটার দিকে তাকাল ভবন সিং। চাচার গ্রামের মতই শূন্য আর ফাঁকা লাগল। কোথাও আলো জ্বলছে না, মানুষজনেরও সাড়া নেই। অথচ এ সময়টাতে বাচ্চাদের হাসি-কান্না, রাখালের গরুর পাল গোয়ালে ঢোকানোর হ্যাট-হ্যাট আওয়াজ আর শিকারের নেশায় ঘুরে বেড়ানো চিতাকে তাড়ানোর জন্য রাতের প্রহরী কুকুরদের ঘেউ ঘেউতে গ্রাম জেগে

থাকবার কথা।

কিন্তু না শোনা যাচ্ছে কোন শব্দ, না দেখা যাচ্ছে কোন আলো। দমকা একটা হাওয়া উঠল, পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ করল, গোঙাল। চাঁদ উঠতে এখনও দেরি, ঘুটঘুটে অন্ধকারের চাদর ঢেকে রেখেছে চরাচর। তবে পথ চলতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না ভবন সিঙের। এ রাস্তা ছোটবেলা থেকে তার চেনা। যদিও এ মুহূর্তে কেমন অচেনা ঠেকছে। গ্রামের সীমান্তে নিচু জাতের মানুষ বেথালুর বাড়ি। নিয়মই আছে, নিচু জাতের মানুষরা মূল গ্রামে ঘর বানাতে পারবে না, খানিকটা দূরে থাকবে।

মূল রাস্তাটা চলে গেছে বেথালুর জীর্ণ কুটিরের পাশ দিয়ে। বর্ষার সময় ফুটো ছাদ দিয়ে জল ঝরে। নতুন সেলেট পাথরের টাইলস বসানোর সামর্থ্য নেই হতদরিদ্র বেথালুর। শীতকালে ভাঙা টাইলসের ফাঁক দিয়ে তুষার ঢোকে। গরমে প্রচণ্ড উত্তাপ আর মাছির জ্বালাতনে ঘরে ঘুমানোর উপায় নেই। কুটিরের দিকে তাকাতে আলোর চিলতে একটা রেখা চোখে পড়ল ভবন সিঙের। যাক, ভিতরে তা হলে কেউ আছে, মনে মনে বলল সে। নিচু আলে নেমে পড়ল ভবন, পা বাড়াল বেথালুর বাড়ির দিকে।

আলোটা যেন আশার বাতি, জীবনের চিহ্ন।

কুটিরের নিচু, সরু দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ভবন সিং। ভিতরে কে থাকতে পারে অনুমানের চেষ্টা করল। বেথালুর নাম ধরে ডাকল। ভিতর থেকে সাড়া দিল একটা কণ্ঠ। ওকে ঘরে যেতে বলছে। দরজার ফাঁক এত সরু, কাঁধের ঝোলাটা দোর-গোড়ায় রেখে দিতে হলো ভবন সিংকে। শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ভিতরে ঢুকল সে। মানুষের একটা আকৃতি দেখতে পেল, বসে আছে ম্লান আলো নিয়ে জ্বলতে থাকা মাটির প্রদীপের পাশে। হলুদ আলোটা ঘরের অন্ধকার দূর করতে পেরেছে সামান্যই, তবু বাইরের নিকষ আঁধারের গহ্বর থেকে তো মুক্তি

মিলেছে, যেন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল ওকে প্রদীপের আলো।

ঘরে অদ্ভুত একটা গন্ধ, তবে ব্যাপারটা আমল দিল না ভবন সিং। সে শুধু জানতে চায় তার পরিবারের হদিশ আর গ্রামবাসীরা কোথায় গেল।

'লোকজন সব গেল কই?' জিজ্ঞেস করল সৈনিক।

অন্ধকারে উবু হয়ে বসে থাকা মানুষের আকৃতির কাছ থেকে কোন জবাব এল না। আবার প্রশ্নটা করল ভবন সিং, এবারও নিরুত্তর ও পক্ষ।

'তুমি কে?' এবার ধমকের সুরে জানতে চাইল ভবন সিং। সামান্য নড়ে উঠল মূর্তি, তারপর বহুদিন ধরে কথা বলেনি বা কথা বলতে অভ্যস্ত নয় এমন ভঙ্গিতে সে বলল, 'কী! তুমি?'

কণ্ঠস্বরটা ধাতু কাটবার করাতের মত খনখনে, ভবন সিং-এর গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল। শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ শীতল জল নামল, দাঁতে দাঁত বাড়ি খেয়ে ঠক ঠক শব্দ তুলল। ঘরের গন্ধটাকে চিনতে পেরেছে সে। এ মৃত্যু আর লাশের গন্ধ। পচা লাশ।

'কথা বলো,' চেঁচিয়ে উঠল ভবন সিং, গলার স্বরে ক্রোধের চেয়ে আতঙ্ক বেশি।

'ভয় পেয়ো না,' বলল মূর্তি।

'আমি ভয় পাইনি,' প্রতিবাদ করল সৈনিক।

'উঁহুঁ, ঠিকই ভয় পেয়েছ তুমি,' বলল লোকটা।

ভবন সিং লাফ দিয়ে তার ঘাড়ে পড়ল। টুঁটি চেপে ধরবার জন্য বাড়ানো হাত ঝাঁকি খেল বাতাসে। চোখের পলকে সরে গেছে মূর্তি। পেছন থেকে খলখল করে হেসে উঠল ওটা। ভয়ঙ্কর হাসিটা প্রতিধ্বনি তুলল ঘরে, ছড়িয়ে পড়ল নির্জন গ্রামে। ঝট করে ঘুরল ভবন সিং। কেউ নেই। তরুণ সৈনিকের আগেও ভয় পাবার অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু এ ভয় অন্যরকম, কোন কিছুর সাথে মেলে না। সারা শরীর হিম হয়ে এল তার।

এমন সময় নিভে গেল প্রদীপ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে গেল কুটির। ভবন সিঙের পা যেন পেরেক দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে মেঝেতে। নড়তে চাইছে, পারছে না। শরীরের কোন পেশী সাড়া দিচ্ছে না। মৃত্যু আর পচা লাশের গন্ধটা আবার ভক্ করে নাকে ঢুকতে অসাড় দশা থেকে মুক্তি পেল সে। ঘর ভরে গেছে বীভৎস দুর্গন্ধে। বন্ধ হয়ে আসছে দম।

পা যেন সীসার মত ভারী, অনেক কষ্টে কদম ফেলল ভবন সিং, মাথা ঝুঁকে রয়েছে নীচে, শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলল দরজার দিকে। মাত্র কয়েক পা এগোল সে, মনে হলো মাইলের পর মাইল রাস্তা দৌড়েছে। ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে, বুকটা যেন ফেটে যাবে বাতাসের অভাবে।

কিছুক্ষণ পরে ভবন সিং নিজেকে আবিষ্কার করল মাটিতে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে। হিঁচড়ে টেনে তুলল শরীরটাকে। সিধে হলো। তাকাল চারদিকে। কুটিরটা আগের মতই সুনসান। দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ঝোলা যথাস্থানেই রয়েছে। ঝোলাটা খুলল ভবন সিং, বের করল জলের বোতল। খালি। আশ্চর্য তো! ভাবল সে। গ্রামে ঢোকার আগে ঝর্ণার জলে বোতল ভরেছে। তারপর এক ঢোকও খায়নি। জল কে খেল?

'তেষ্টা পেয়েছে?' কানের কাছে বিস্ফোরিত হলো একটা গলা। লাফিয়ে উঠল ভবন সিং। গলা এমন শুকিয়ে আছে, রা বেরুল না মুখ ফুটে। হঠাৎ একটা হাত জলের ঘটি নিয়ে হাজির হলো অন্ধকার ফুঁড়ে। পিতলের ঘটির গায়ে পিছলে গেল সদ্য আকাশে ওঠা চাঁদের আলো। ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে ঘটিটা টেনে নিল ভবন সিং। ঢকঢক করে পুরো ঘটিই ফাঁকা করে ফেলল। তারপর তার খুব খিদে পেয়ে গেল।

'খিদে লেগেছে?' আবার কানের কাছে শোনা গেল সেই কণ্ঠ। ভবন এবারও কোন কথা বলল না। ভয়ের প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে সে। এসব কী ঘটছে ভেবে বিস্মিত। অন্ধকারে

চোখ কুঁচকে তাকাল ভবন। কিছুই দেখতে পেল না। শুধু ভারী নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কণ্ঠটা আবার জানতে চাইল, 'তোমার মায়ের হাতের রান্না খাবে?'

সাহস নিয়ে জিজ্ঞেস করল সৈনিক, 'তুমি কে? আমাকে কিছু খেতে দিতে পারবে?'

জবাব এল, 'অপেক্ষা করো। দিচ্ছি।'

ভবনের মনে হলো কেউ সর্ষের পাতা বাড়িতে তৈরি মাখনের মধ্যে ফেলে রান্না করছে, ভাজছে রুটি, বানাচ্ছে হালুয়া। একটু পরেই খাবারগুলো হাজির হয়ে গেল তার সামনে। ওদিকে হাত না বাড়িয়ে থাকতে পারল না ভবন সিং। কণ্ঠটা বলল, 'খাও, বাছা, পেট ভরে খাও...'

কণ্ঠটার মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ছিল, ঘাড়ের চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল ভবন সিঙের। মনে হতে লাগল খুব খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে তাকে নিয়ে। ভয়ের অনুভূতি খিদে নষ্ট করে দিল। এখন সে এই অশুভ জায়গাটা থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

এমন সময় ভবন সিং টের পেল তার ঘাড়ে বরফ শীতল একটা হাত রেখেছে কেউ। কণ্ঠটা মিনতি করছে ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগে খাবারটা খেয়ে নিতে। আর সহ্য করতে পারল না ভবন সিং, পলাতক ঘোড়ার বেগে ছুটল। মাঠ পেরিয়ে দৌড়াচ্ছে সে। লাফ মেরে পার হচ্ছে খানা-খন্দ। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সর্ষে খেতের একটা গর্তে অল্পের জন্য আছাড় খেল না। ওর পেছনে আরেক জোড়া পায়ের শব্দ। ছুটে আসছে। শোনা গেল খনখনে একটা গলা, 'কোথায় পালাবে, বাছা? অনেক দিন না খেয়ে আছি। তোমাকে আমি ছাড়ছি না।'

জান বাজি রেখে ছুটছে সৈনিক। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক, ব্যথায় দপদপ করছে পা, তবু এক মুহূর্তের জন্য গতি

কমাল না। সর্ষে খেতের মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে ভবন সিং, আর পেছনে ছুটে আসছে পিশাচটা। ভীষণ কণ্ঠটা একই হুমকি দিয়ে চলেছে। কোথাও লুকিয়ে পড়ার জায়গা খুঁজছে ভবন। ছুটতে ছুটতে ছোটবেলায় বাবার কাছে শোনা একটা কথা মনে পড়ে গেল তার।

'মনে রাখিস, বাছা,' বলেছিলেন বৃদ্ধ, 'কোন মন্দ আত্মা, পিশাচ বা ডাইনি যা-ই তাড়া করুক না কেন, চট করে কোন গোয়াল ঘরে ঢুকে জড়িয়ে ধরবি গরুর গলা। পিশাচ বা প্রেতাত্মারা গরুকে অত্যন্ত পবিত্র জিনিস মনে করে। ভয় পায়। একবার গোয়াল ঘরে ঢুকে পড়তে পারলে বেঁচে যাবি জানে।'

ভবন সিঙের মনে পড়ল কাছেই একটা গোয়াল ঘর আছে। দিক বদলাল সে, ঝড়ের গতিতে ছুটল গোয়াল ঘরের দিকে। ভিতরে ঢুকছে, ইস্পাতের মত কঠিন এবং ঠাণ্ডা একটা হাত ওর এক পায়ের গোড়ালি চেপে ধরল। মরিয়া ভবন সিং শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি মেরে মুক্ত করে আনল পা-টা, টাল সামলাতে না পেরে আছাড় খেল গরুর ঘাড়ে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরল প্রাণীটির গলা, আকুল প্রার্থনা করল যেন পিশাচের হাত থেকে রক্ষা পায়।

এ মুহূর্তে তার একমাত্র রক্ষাকর্তা এই গরু। গোয়াল ঘরের বাইরে ফোঁস ফোঁস শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে কেউ। অনেকখানি রাস্তা দৌড়ে এসে পরিশ্রান্ত। ভবন সিং-এর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এল, তবে হৃৎপিণ্ডটা যেন মুখে চলে এসেছে। বাবা বলেছিলেন পিশাচদের শক্তি থাকে শুধু রাত অবধি, ভোরের আলো ফুটলেই তারা নিজেদের ডেরায় ফিরে যায়। কাজেই সকাল পর্যন্ত ভবনকে এ গোয়াল ঘরে থাকতে হবে। বাইরে থেকে কণ্ঠটা বলল, 'গরুর আয়ু বেশিক্ষণ নেই, বাছা। আর ওটা অক্কা পাওয়া মাত্র আমি এসে তোমাকে খেয়ে ফেলব।'

গরুটার সত্যি অন্তিম দশা। ওটার ঘাড়ের মোটা শিরায়

আঙুল ছোঁয়াল ভবন সিং। পালস অনিয়মিত আর খুবই মৃদু। গরু মা, প্রার্থনা করল সে, আমাকে বাঁচাও। মরে যেয়ো না দয়া করে। গরুর ঘাড় টিপে দিতে লাগল ভবন; প্রাণীটি অন্তত রাতটা পার করে দিতে পারবে, সেই আশায়। টের পেল বাইরে সেন্ট্রির ডিউটি পালন করার মত পায়চারি করে চলেছে পিশাচ।

ক'টা বাজে জানে না ভবন সিং। শুধু জানে সকাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে হবে গরুটিকে। গরু মারা গেলে সে-ও বাঁচবে না। প্রাণীটিকে উষ্ণ রাখতে শরীর আর ঘাড় ডলে দিতে লাগল ভবন, খড় তুলে দিল মুখে। হাত ব্যথায় বিষ হয়ে গেল। আর পারছে না সে।

এমন সময় আলোর সরু একটা রেখা দেখা গেল, আস্তে আস্তে গোয়াল ঘরের দরজার কাঠামো ফর্সা হয়ে উঠল। নেকড়ের ডাকের মত বিকট গলায় কেউ ডেকে উঠল বাইরে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সেই রোমহর্ষক আওয়াজ। ভয়ানক আঁতকে উঠল ভবন সিং, আত্মা পানি হয়ে গেল অমানুষিক ডাকটাতে। কানে হাত চাপা দিল, কিন্তু হাড়ের মধ্যে যেন ঢুকে গেল ভয়ঙ্কর শব্দটা। যেন আর্টিলারী বোমা বর্ষণ হচ্ছে মাথার উপর!

অকস্মাৎ নীরবতা নেমে এল। কিন্তু এ নীরবতাও বড় অস্বাভাবিক আর যন্ত্রণাদায়ক। কোথাও ডেকে উঠল কাক, একই সাথে গরুটা ঢলে পড়ে গেল ভবন সিঙের কোলে। মারা গেছে। আস্তে আস্তে গরুটাকে মাটিতে শুইয়ে রাখল সে, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। মুখ হাঁ করে সকালের মিষ্টি, তাজা পাহাড়ি বাতাস টানল বুক ভরে। ভোরের আলোয় ভয়ডর চলে গেছে। ওর কাছে গোটা ব্যাপারটাই স্বপ্ন মনে হচ্ছে। সত্যি কি কাল রাতের ঘটনাটা স্বপ্ন ছিল? দুঃস্বপ্ন? পায়ের দিকে তাকাল সে। পা হলুদ হয়ে আছে। সর্ষে খেতে দৌড়ানোর ফল।

যা ঘটেছে তা সত্যি কিনা দেখতে বেথালুর কুটিরের দিকে

এগোল ভবন। দোর-গোড়ায় এসে দেখল ওর ঝোলাটা এখনও দেয়ালে হেলান দেওয়া। সমস্ত সাহস এক করে ছোট্ট কুটিরে ঢুকে পড়ল সে। ভাঙা ছাদের ফুটো দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। ঘরের এক কোণে কেউ শুয়ে আছে, সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা শরীর।

চাদরটা টান দিয়ে সরাল। সঙ্গে সঙ্গে সাংঘাতিক চমকে উঠল। একটা লোক। মৃত। গন্ধে মনে হলো বেশিক্ষণ হয়নি মারা গেছে।

লাশটা নগ্ন। তার পা জোড়া হলুদ। সর্ষে খেতে দৌড়ানোর ফল। অবিকল ওরই মুখ! পা টিপে টিপে ওদিকে এগোল ভবন।

মূল গল্প: সুধীর থাপলিয়ালের 'দ্য ইয়েলো লেগড ম্যান'

অপেক্ষা

বিকেল চারটা বেজে কয়েক মিনিট। হঠাৎ কালো হয়ে এল আকাশ, ঝুপ করে প্রকৃতিকে গ্রাস করল অন্ধকার, ঝমঝমিয়ে নামল বরফ-শীতল বৃষ্টি। কেনসিংটন গার্ডেন্স-এর রাস্তা কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় ভরে গেল ছাতাঅলা মানুষে। আচম্বিত বৃষ্টির হামলায় দিশেহারা ছাতাহীন লোকজন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটাছুটি শুরু করে দিল, বাচ্চারা নিমিষে কাকভেজা হয়ে তারস্বরে কাঁদতে লাগল।

তারপর কোন্ এক যাদুমন্ত্র বলে খালি হয়ে গেল রাস্তা। মুষলধারে বৃষ্টিতে মনের সুখে প্যাঁক প্যাঁক জুড়ে দিল কানাডা গীজ-এর দল, দমকা বাতাসে পাগলের মত নাচতে থাকল গাছের পাতা। মারজোরি লক্ষ করল সে একা, আকাশ নীল মাদার কেয়ার প্রামে বসা উইলিয়ামকে দ্রুত ঠেলে নিয়ে চলেছে। মারজোরির পরনের লাল টুইড জ্যাকেট আর লম্বা কালো স্কার্ট পানিতে ভিজে সপসপে। বাড়ি থেকে বেরুনোর সময়ও আকাশ ছিল নির্ভেজাল পরিষ্কার, ডিনার-প্লেটের মত চকচকে নীল। তাই সঙ্গে ছাতা নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি মারজোরি। এমনকী প্লাস্টিকের রেইন-হ্যাটটি পর্যন্ত আনেনি।

মারজোরি অবশ্য জানত না মাইকেল চাচাকে এতটা সময় দিতে হবে। চাচা খুবই বুড়ো হয়ে গেছেন। খাট থেকে নড়ার শক্তিও তেমন নেই। মাঝে মাঝে বেগ সামলাতে না পেরে বিছানাতেই পায়খানা-প্রশ্রাব করে দেন। ওসব পরিষ্কার করতে হয়েছে মারজোরিকে। চা বানিয়েছে, নতুন বিছানা পেতে

দিয়েছে। ঘরের টুকটাক আরও কিছু কাজ করেছে। ওই সময় উইলিয়াম সোফায় শুয়ে আপনমনে হাত-পা ছুঁড়ে খেলেছে। চাচা নজর রেখেছেন উইলিয়ামের উপরে। শত রোগের কারণে তাঁর চোখ সব সময় ছলছলে দেখায়, হাতজোড়া হলুদ টিস্যু পেপারের মত। স্মৃতিশক্তিও প্রায় হারাতে বসেছেন চাচা। কখনও অতীতের কথা মনে পড়ে যায়, পরমুহূর্তে ভুলে যান। এ যেন বিকেলের রোদ। কখনও উজ্জ্বল, কখনও ছায়াময়। বেরুবার আগে মাইকেল চাচাকে চুমু খেয়েছে মারজোরি, তার হাতজোড়া নিজের মুঠোয় নিয়ে তিনি ফিসফিস করেছেন, 'ছেলেটার দিকে খেয়াল রেখো। কে ওর উপর নজর রাখছে তুমি হয়তো কোনদিনই জানতে পারবে না। কে ওকে চাইছে তাও জানবে না।'

'চাচা, তুমি ভাল করেই জানো আমি ওকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করি না,' অসহিষ্ণু শুনিয়েছে মারজোরির গলা। 'আর কেউ ওকে চাইলে তার জন্যে আমার দুয়ার খোলা। উইলিয়ামের জ্বালায় রাতে ঘুমাতেও পারি না।'

'ওভাবে বোলো না, মারজোরি। কখনও বলবে না অমন কথা। অনেক মা-ই ঠাট্টা করে এমন কথা বলে। পরে অনুতাপে নিজেদের জিভ কেটে ফেলতে চেয়েছে তারা।'

'চাচা...অত দুশ্চিন্তা কোরো না। আমি বাসায় ফিরেই তোমাকে ফোন করব তুমি ঠিক আছ কিনা জানতে। এখন উঠি। আজ রাতে চিকেন শসার রান্না করছি।'

মাথা দুলিয়েছেন মাইকেল চাচা। 'চিকেন শসার...' অস্পষ্ট গলা। তারপর যোগ করেছেন, 'প্যানের কথা ভুলো না।'

'ভুলব না। আর ওটা পুড়িয়েও ফেলব না। দরজার খিলটা ভাল করে আটকে দাও। গেলাম!'

এ মুহূর্তে রাউন্ড পন্ডের পাশ ধরে হাঁটছে মারজোরি। ভেজা, কাদামাখা ঘাসে চাকা আটকে যাচ্ছে বলে প্রামের গতি মন্থর। অবশ্য এমন ভিজে গেছে ও তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলেই বা কী

লাভ? পুরানো একটা চিনা প্রবাদ মনে পড়ে গেল, 'বৃষ্টিতে জোরে হাঁটার দরকার কী? মাথার ওপরে তো অঝোরে সে ঝরছেই।'

রাউন্ড পন্ডটি কিছুক্ষণ আগেও ছিল শান্ত, পরিষ্কার। হাঁসের দল পানিতে ভেসে বেড়িয়েছে, বাচ্চারা কাগজের নৌকা ভাসিয়েছে পানিতে। এখন পুকুরটাকে ভীতিকর লাগছে। বিশ্রী, আঁশটে একটা গন্ধ আসছে, কানাডা গীজরা দাপাদাপি করে ঘোলাটে করে ফেলেছে পানি। মারজোরির পিগটটা গত বসন্তে চুরি হয়ে গিয়েছিল। পরে ওটার খোঁজ মিললেও ভাঙা-চোরা, সারা গায়ে প্রশ্রাবের দাগ এবং গন্ধঅলা গাড়িটাকে আবার চালানোর কথা কল্পনাও করতে পারেনি সে। নতুন গাড়িও আর কেনা হয়ে ওঠেনি।

গাছের নীচে দিয়ে বেরিয়ে এল মারজোরি, গালের পাশে ঠাণ্ডা বৃষ্টির ছিটে লাগল বিস্ফোরণের মত। জেগে গেছে উইলিয়াম, হাত নাড়ছে। নড়াচড়া দেখেই মারজোরি বুঝতে পেরেছে খিদে পেয়েছে ছেলের। বাসায় ফিরেই উইলিয়ামের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

শর্টকাট রাস্তা ধরেছে মারজোরি, এক সারি গাছের নীচ দিয়ে কোনাকুনি হাঁটছে। বাগানের দুই প্রান্ত থেকে লন্ডনের ব্যস্ত রাস্তার ভোঁতা আওয়াজ ভেসে আসছে, মাথার উপরে কান ফাটানো শব্দে উড়ে গেল একটা এয়ার লাইনার। তবে বাগানটা খালি এবং নিস্তব্ধ, যেন যাদু দিয়ে এমনটি করা হয়েছে। গাছের ডালপালার আড়াল থেকে ছিটকে আসা আলোর রং স্লেট পাথরের মত। প্রামের হাতল ধরে সামনে ঝুঁকল মারজোরি, 'আমরা একটু পরেই বাড়ি পৌঁছে যাব, মি. বিল। এইতো বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি।'

মুখ তুলে তাকাতেই লোকটাকে দেখতে পেল ও। ওক গাছের পাশে, হাত বিশেক দূরে, ঠিক ওর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। লম্বা,

রোগাটে সেঃ মাথায় কালো টুপি, গায়ের কালো কোটের কলার ওল্টানো। টুপিতে প্রায় ঢাকা পড়েছে চোখ। তবে লোকটার অস্বাভাবিক সাদা মুখটা দেখা গেল পরিষ্কার। বোঝাই যায় মারজোরির জন্য অপেক্ষা করছে সে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটা। তাকাল এদিক-ওদিক। বুকের খাঁচায় প্রবল বেগে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। আশপাশে দেখা যাচ্ছে না কাউকে, গলা ফাটিয়ে ফেললেও কারও কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা নেই। ওর মাথার উপরে, গাছের পাতায় একটানা ছন্দে ঝরছে বৃষ্টি। উইলিয়াম হঠাৎ কেঁদে উঠল ভ্যাঁ করে। ঢোক গিলল মারজোরি, গলার মধ্যে যেন ঠেসে ঢোকানো হয়েছে ফ্রুটকেক আর মল, বমি এসে গেল ভয় আর আতঙ্কে। কী করবে বুঝতে পারছে না।

দৌড় দিয়ে লাভ হবে না, মনে মনে ভাবল মারজোরি। শান্ত ভাবে হেঁটে যাব ওর পাশ দিয়ে। এমন ভাব করব যেন ভয় পাইনি। আমি তো প্রামে করে আমার বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছি। লোকটা নিশ্চয়ই অতটা হৃদয়হীন নয় যে...

কে ওর উপর নজর রাখছে তুমি হয়তো কোনদিনই জানতে পারবে না। কে ওকে চাইছে তাও জানবে না।

চাচার কথাটা মনে পড়তে বুকের ধুকপুকুনিটা দ্বিগুণ হয়ে গেল মারজোরির। তবে হাঁটতে শুরু করল ও। লোকটা যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। স্থির। লোকটার সামনে দিয়ে যেতে হবে মারজোরিকে। লোকটা কি ওদেরকে লক্ষ করেছে? আচরণে সেরকম কোন ভাব না ফুটলেও মারজোরি নিশ্চিত ওদেরকে দেখেছে লোকটা। তবে মারজোরির পথ আটকে দাঁড়াবার মতলব তার আছে বলে মনে হচ্ছে না।

ধীর গতিতে আগন্তুকের দিকে এগিয়ে চলল মারজোরি, ভয়ের চোটে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। লোকটার পাশ কাটাচ্ছে সে এবার, এত কাছে দিয়ে যে আগন্তুকের কোটের উপর জমে থাকা

বৃষ্টির টলটলে ফোঁটাও দেখতে পাচ্ছে মারজোরি। এত কাছে যে লোকটার গায়ের গন্ধ নাকে ধাক্কা দিল তার। তামাকের গন্ধের সাথে মিশে আছে শুকনো কেমন একটা দুর্গন্ধ, খড়ের মত। মারজোরি ভাবল: থ্যাঙ্ক গড। লোকটা আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে দিচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ছোবল মারল লোকটার ডান হাত, খপ্ করে চেপে ধরল মারজোরির কনুই, প্রবল টানে ওকে ঘুরিয়ে দিল তার দিকে, প্রচণ্ড শক্তিতে ওক গাছের গুঁড়ির উপর ছুঁড়ে ফেলল, শোল্ডার ব্লেড ভাঙার আওয়াজ শুনতে পেল মারজোরি, এক পাটি জুতো ছিটকে গেল শূন্যে।

তীব্র ব্যথা এবং আতঙ্কে চিৎকার দিল মারজোরি। সাথে সাথে লোকটার হাতের উল্টো পিঠের বিরাশি সিক্কার চড় খেল মুখে, বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। পরমুহূর্তে আবার মারল সে।

'কী চাও তুমি?' ফোঁপাচ্ছে মারজোরি। 'আমার কাছে কী চাও তুমি?' মারজোরির জ্যাকেটের ল্যাপেল মুঠো করে ধরল আক্রমণকারী, হেঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল ওকের শক্ত ছালের গায়ে। লোকটার গর্তে ঢোকা চোখ জ্বলজ্বল করছে, ঠোঁটজোড়া নীলচে-ধূসর, ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত বিকট হাসির ভঙ্গিতে।

'কী চাও তুমি?' অনুনয়ের সুর মারজোরির কণ্ঠে। তার বাঁ কাঁধে আগুন জ্বলছে, বাম হাঁটুটা দপ্দপ্ করছে ব্যথায়। 'আমার বাচ্চাটার আমি ছাড়া কেউ নেই। আমাকে দয়া করে মেরো না। আমার বাচ্চাটার আমি ছাড়া কেউ নেই।'

মারজোরি টের পেল উরুর কাছ থেকে এক টানে ছিঁড়ে ফেলা হলো স্কার্ট। ওহ্ গড, ভাবল ও, ওটা যেন না ঘটে। প্লিজ, ওটা যেন না ঘটে। ভয়-আতঙ্ক-ব্যথায় টলে পড়ে যাচ্ছিল মারজোরি, লোকটা আবার টেনে তুলল ওকে। ভয়ানক জোরে মাথাটা ঠুকে দিল গাছে। জ্ঞান হারাবার দশা হলো মারজোরির।

এরপরে কী ঘটেছে ওর ঠিক মনে নেই। টের পাচ্ছিল টান মেরে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে আন্ডারওয়্যার, লোকটা ঠেসে ধরেছে ওর শরীরের সঙ্গে তার শরীর। ভয়ানক ঠাণ্ডা লোকটার গা। এমন কী লোকটা যখন ওর শরীরে ঢুকছে তখনও হিম ঠাণ্ডা লাগল। মুখে বৃষ্টি পড়ছে মারজোরির, লোকটার ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দ শুনল ও, সেই সাথে কর্কশ হা! হা! হা! তারপর লোকটা গালি দিল কাউকে, এরকম অদ্ভুত গালি কাউকে দিতে শোনেনি মারজোরি।

মারজোরি বলতে যাচ্ছিল, 'আমার বাচ্চা', সেই মুহূর্তে লোকটা আবার আঘাত করল ওকে।

এ ঘটনার কুড়ি মিনিট বাদে মারজোরিকে দেখা গেল বেসওয়াটার রোডের বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে এক আমেরিকান দম্পতির সঙ্গে, তারা ট্রেডার ভিকস জায়গাটার ঠিকানা জানতে চাইছে।

প্রামটিকে পাওয়া গেল আগের জায়গায়। তবে ওটা খালি।

জন প্রস্তাব দিল, 'চলো, ক'দিনের জন্যে কোথাও থেকে ঘুরে আসি।' জানালার ধারের একটা চেয়ারে বসে লেবু চা খাচ্ছে মারজোরি। দৃষ্টি বেসওয়াটার রোডের দিকে। ওদিকেই সারা দিন রাত চেয়ে থাকে সে। চুল কেটে ছেলেদের মত ছোট করে ফেলেছে মারজোরি, মুখখানা মোমের মত সাদা। পরনে কালো পোশাক। সবসময় তা-ই পরে সে।

ম্যান্টলপীসের ঘড়ি জানান দিল তিনটে বাজে। জন বলল, 'নেস্তা সব সময় যোগাযোগ রাখবে—যদি কোন আশার বাণী শোনা যায়।'

ঘুরল মারজোরি, জনের দিকে তাকিয়ে দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল। ওর চোখের বিষাদময়তা আবারও কষ্ট দিল জনকে। 'আশার বাণী?' ব্যঙ্গ ফুটল মারজোরির কণ্ঠে। উইলিয়াম নিখোঁজ হবার

পরে দেড় মাস কেটে গেছে। যে-ই ওকে নিয়ে যাক, হয় খুন করে ফেলেছে নতুবা আর কোনদিন ফেরত দেবে না।

কাঁধ ঝাঁকাল জন। চেহারার দিক থেকে সুদর্শন আখ্যায়িত হলেও ঠিক দৃঢ় স্বভাবের বলা যাবে না তাকে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বড় বেশি কাজ করে তার মধ্যে। এজন্যই এখন পর্যন্ত কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারেনি। ভেবেছিল কোনদিন বিয়ে করবে না। কিন্তু তার ছোট ভাইয়ের একুশতম জন্মদিনে মারজোরিকে দেখার পরে মত বদলে ফেলেছে। মারজোরির লাজুক এবং জেদি ভাবটা তাকে মুগ্ধ করে। মারজোরির খেয়ালি আচরণও তার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মারজোরি তাকে যে সব কথা বলেছে এর আগে আর কোন মেয়ে তা বলেনি–চোখ খুলে গেছে জনের প্রতিদিনকার জীবনের সাধারণ যাদুময় দিকগুলো লক্ষ করে।

কিন্তু মারজোরি এখন নিজেকে নিজের মাঝে বন্দি করে ফেলেছে, তার অন্তরে শোক ছাড়া কিছু নেই। মারজোরির অসুখী চেহারা জনের জীবন থেকেও আলো আর রঙকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। মারজোরিকে দেখে শঙ্কা জাগে, ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে সে।

লাইব্রেরিতে বেজে উঠল ফোন। ঘুরে বসল মারজোরি। বিষণ্ন বিকেলের কুয়াশা গায়ে মেখে ছুটছে বাস আর ট্যাক্সিগুলো। তবে রেইলিং-এর ওপাশে, কেনসিংটন গার্ডেনস-এর গাছপালা অটল দাঁড়িয়ে অন্ধকারে। যেন গোপন কিছু একটা আছে তাদের মাঝে। গোপন কথাটা জানার জন্য মারজোরি তার সব কিছু ত্যাগ করতে রাজি। তার দৃষ্টিশক্তি, তার আত্মা, তার জীবন।

মারজোরির বিশ্বাস, কেনসিংটন গার্ডেনস-এর কোথাও বেঁচে আছে তার উইলিয়াম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কান খাড়া করে রাখে সে গাড়িঘোড়ার আওয়াজ ছাপিয়ে বাচ্চার কান্না শোনার উদগ্র বাসনায়। ইচ্ছে করে বেসওয়াটার রোডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, হাত তুলে চিৎকার করে বলে, 'তোমরা সবাই থামো! এক

মিনিটের জন্যে দাঁড়াও। আমার বাচ্চাটার কান্না শুনতে পাচ্ছি যেন!'

জন ফিরে এল লাইব্রেরি থেকে। ঘন, খয়েরি চুল খামচে ধরে আছে হাত দিয়ে। 'চিফ ইন্সপেক্টর ক্রসল্যান্ডের ফোন। তোমার কাপড় যে অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছিল তার ফরেনসিক রিপোর্ট পাওয়া গেছে। ওটা বাগানে ব্যবহার করা হয় এমন কোন অস্ত্র। সম্ভবত একজোড়া ক্লিপার কিংবা প্রুনিং হুক। ডাল পালা ছাঁটার কাস্তে। ওরা নার্সারি আর বাগানগুলোতে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।'

এক মুহূর্ত বিরতি দিল জন, তারপর বলল, 'তবে আরও খবর আছে। ওরা ডিএনএ রিপোর্ট পেয়েছে।'

শিউরে উঠল মারজোরি। ধর্ষণের ঘটনাটা মনে আনতে চায় না ও। উইলিয়ামকে খুঁজে পেলে এ বিষয় নিয়ে ভাবা যাবে।

উইলিয়ামকে ফিরে পেলে মারজোরি ছুটি কাটিয়ে আসবে কোথাও থেকে, চেষ্টা করবে সুস্থ হয়ে উঠতে। উইলিয়ামের দেখা মিললে আবার সরব হয়ে উঠবে ওর হৃৎপিণ্ড। বাচ্চাটাকে দু'বাহুর মাঝে জড়িয়ে ধরার আকুলতায় উন্মত্ত হয়ে আছে সে। তার ছোট্ট ছোট্ট আঙুলগুলোর স্পর্শ নিজের হাতের মুঠোয় পেতে চায় মারজোরি।

কেশে গলা পরিষ্কার করল জন। 'ক্রসল্যান্ড বললেন ডিএনএ রিপোর্টে অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন তাঁরা। তাই রিপোর্ট পেতে সময় লেগেছে।'

মারজোরি কোন মন্তব্য করল না। ওর চোখ আবার বাগানে। মনে হয়েছে ওখানে কাউকে নড়তে দেখেছে। গাছের নীচে, লম্বা ঘাসের আড়ালে ছোট্ট, সাদা কী একটা দেখেছে ও এক ঝলক, যেন ছোট একটা হাত নড়ছে। কিন্তু—জানালার পর্দাটা টেনে সরিয়ে দেওয়ার পরে বুঝতে পারল গাছের নীচে সাদা জিনিসটা একটা সীলিহ্যাম (এক ধরনের কুকুর), নড়তে থাকা হাতটা তার

লেজ।

'ডিএনএ রিপোর্ট অনুযায়ী ওই লোকের কোন অস্তিত্ব নেই।'

ধীরে ধীরে ঘুরল মারজোরি। 'কী?' জিজ্ঞেস করল ও। 'অস্তিত্ব নেই কথার মানে কী?'

অপ্রস্তুত দেখাল জনকে। 'জানি না। আমিও এ কথার কোন মানে বুঝতে পারিনি। কিন্তু ক্রসল্যান্ড তাই বললেন। তিনি আসলে বলেছেন মানুষটা মৃত।'

'মৃত? সে মৃত হয় কী করে?'

'পরীক্ষায় নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে। লোকটা মৃত হতে পারে না। নট ক্লিনিক্যালি। ওটা–'

'মৃত,' ফিসফিস করল মারজোরি, যেন আচম্বিতে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে। 'লোকটা মৃত।'

শুক্রবার ভোরে, পাঁচটার সময় ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল জনের। শোবার ঘরের জানালার কাঁচে টপ টপ শব্দে বৃষ্টি পড়ছে, বাড়ির পেছন দিক দিয়ে আবর্জনার ট্রাক চলে যাবার আওয়াজ ভেসে এল।

'চিফ ইন্সপেক্টর ক্রসল্যান্ড বলছি, স্যার। খারাপ খবর আছে। ঝর্ণার ধারে পাওয়া গেছে উইলিয়ামকে।'

বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল জনের। খারাপ খবর মানে কী? বেঁচে নেই উইলিয়াম? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না।

'দু'জন অফিসারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি,' বললেন চিফ ইন্সপেক্টর। 'তাদের একজন মহিলা। দশ মিনিটের মধ্যে রেডি হতে পারবেন, স্যার?'

জন আস্তে ক্রেডলে রেখে দিল রিসিভার। হাঁটুর উপর মুখ রেখে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ, চোখ ভরে গেছে পানিতে। ঢোক গিলল ও, হাতের চেটো দিয়ে মুছে ফেলল অশ্রু, তারপর আস্তে ধাক্কা দিল মারজোরিকে।

চোখ মেলে চাইল মারজোরি, উঠে বসল বিছানায়, এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন চেনে না জনকে। 'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কর্কশ গলায়।

কথা বলার চেষ্টা করল জন, রা ফুটল না।

'উইলিয়ামের ব্যাপার, না?' বলল মারজোরি। 'ওরা খুঁজে পেয়েছে উইলিয়ামকে।'

জনের ছাতার নীচে গায়ে গা ঠেকিয়ে ঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দু'জন। কাছেই একটা অ্যাম্বুলেন্স পার্ক করা, পেছনের দরজা খোলা ওটার, ঝলসাচ্ছে নীল আলো। হেঁটে এলেন চিফ ইন্সপেক্টর ক্রসল্যান্ড। গরুর মাংসের মত টকটকে লাল গায়ের রং, ঠোঁটের উপরে পুরুষ্টু গোঁফ। হ্যাটটা সামান্য উঁচু করলেন তিনি, 'ঘটনাটার জন্যে আমরা খুবই দুঃখিত। যদিও সব সময়ই আশায় ছিলাম আশাপ্রদ কোন খবর শুনব।'

'ওকে পেলেন কোথায়?' জানতে চাইল জন।

'লং ওয়াটারের স্লুইস গেটে আটকে ছিল। ওখানে পাতা-টাতা জমে আবর্জনার স্তূপ হয়ে আছে। তাই সহজে চোখে পড়েনি। নর্দমার ঝাঁঝরি পরিষ্কার করার সময় মেথর শ্রেণীর এক লোক দেখতে পায় তাকে।'

'আমি ওকে একবার দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করল মারজোরি। চিফ ইন্সপেক্টরের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল জন, 'বাচ্চাটার শরীর কতটা গলে পচে গেছে?' কিন্তু সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ক্রসল্যান্ড, মারজোরির কনুই ধরে বললেন, 'আসুন আমার সাথে।'

মারজোরি বাধ্য মেয়ের মত চলল ইন্সপেক্টরের সঙ্গে। ভীষণ শীত লাগছে ওর। মনে হচ্ছে শরীরে এক ফোঁটা শক্তিও নেই। অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে চলে এলেন ইন্সপেক্টর, মারজোরিকে ভিতরে তুলে দিলেন। ওখানে উজ্জ্বল লাল কম্বলে মোড়ানো তার সন্তান,

তার চোখের মণি উইলিয়াম, বুজে আছে চোখ, কপালে কুঁকড়ে, লেপ্টে রয়েছে চুল। মার্বেলের মত সাদা সে, পাথরের মত ধবধবে শরীর।

'ওকে চুমু খাই?' অনুমতি চাইল মারজোরি। মাথা দোলালেন ইন্সপেক্টর।

সন্তানকে চুমু খেল মারজোরি। উইলিয়ামের ঠোঁট এখনও নরম তবে হিমশীতল।

অ্যাম্বুলেন্সের বাইরে দাঁড়ানো জন প্রশ্ন করল, 'ওর লাশটা কতদিন ধরে ওখানে ছিল?'

'আমার ধারণা একদিনের বেশি নয়, স্যার,' জবাব দিলেন ইন্সপেক্টর। 'অপহরণের সময় বাচ্চাটার পরনে যা ছিল সে-পোশাকেই ওকে পেয়েছি। আর শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।'

জন চোখ ফেরাল অন্য দিকে। 'ব্যাপারটা ঠিক মেলাতে পারছি না।'

চিফ ইন্সপেক্টর ওর কাঁধে হাত রাখলেন। 'আমিও না, স্যার।'

পরদিন সারাদিন বৃষ্টি আর রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরির মাঝে মারজোরি একা হেঁটে বেড়াল কেনসিংটন গার্ডেনসে। পায়চারি করল ল্যাংকাস্টার ওয়াকে, ওখান থেকে চলে গেল বাজ'স ওয়াকে, দাঁড়াল রাউন্ড পন্ডের ধারে। তারপর ফিরতি রাস্তা ধরল লং ওয়াটারের উদ্দেশে, থামল পিটার প্যানের মূর্তির পাশে। আবার শুরু হয়েছে আকাশের কান্না, বৃষ্টির পানি পিটারের নলের শেষ মাথা দিয়ে পড়ছে, গাল বেয়ে ঝরছে, যেন কাঁদছে পাথরের মূর্তি।

এ বাচ্চাটা কখনও বড় হবে না, ভাবল মারজোরি। উইলিয়ামের মত।

ও ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, হঠাৎ মনের কুঠুরিতে ঝিলিক দিল স্মৃতি।

উইলিয়ামকে ধরে নিয়ে যাবার দিন মাইকেল চাচার বাসায় গিয়েছিল মারজোরি। কী যেন বলেছিলেন তিনি?

মারজোরি বলেছিল, 'আজ রাতে চিকেন শসার রান্না করছি।'

আর চাচা বলেছিলেন, 'চিকেন শসার...' তারপর চুপ হয়ে যান তিনি, দীর্ঘ বিরতির পরে বলেন, 'প্যানের কথা ভুলো না।'

মারজোরি ভেবেছে চাচা প্যান বলতে সসপ্যান বুঝিয়েছেন। কিন্তু তা হলে তিনি 'প্যানের কথা ভুলো না' বলবেন কেন? চাচা আগে কখনও রান্না নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি। তিনি আসলে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন কেনসিংটন গার্ডেনসে কেউ নজর রাখতে পারে মারজোরির উপরে। কেউ কেনসিংটন গার্ডেনসে ছিনিয়ে নিতে পারে উইলিয়ামকে।

প্যানের কথা ভুলো না।

মারজোরি ঘরে ঢুকে দেখল সোফায় বসে আছেন তিনি মেরুন রঙের উলের কম্বল মুড়ি দিয়ে। ঘরে গ্যাস আর দুধ পোড়ার গন্ধ। জালের পর্দা ভেদ করে ঠাণ্ডা চা রঙের এক ফালি সূর্য রশ্মি ঢুকেছে ঘরে; মাইকেল চাচার মুখখানা সে আলোতে আরও ম্লান এবং বুড়োটে লাগছে।

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি,' ফিসফিসে গলায় বললেন তিনি।

'তুমি আমাকে আশা করেছিলে?'

অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটল তাঁর ঠোঁটে। 'তুমি মা। আর মায়েরা সব বুঝতে পারে।'

চাচার পাশের চেয়ারে বসল মারজোরি। 'যেদিন উইলিয়ামকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল...তুমি বলেছিলে "প্যানের কথা ভুলো না।" আমি এ কথার যে অর্থ বুঝেছি তুমি কি সেটাই

বোঝাতে চেয়েছিলে?'

চাচা মারজোরির হাত টেনে নিলেন নিজের মুঠোয়। ধরে রাখলেন। তাঁর চেহারায় সহানুভূতি আর বেদনার ছাপ। 'প্যান প্রতিটি মায়ের জন্যে দুঃস্বপ্ন। সব সময় ছিল। ভবিষ্যতেও থাকবে।'

'তার মানে এটা কোন কল্প কাহিনী নয়?'

'আ–স্যার জেমস বেরী যেভাবে বর্ণনা করেছেন পরী, জলদস্যু আর ইন্ডিয়ানদের নিয়ে–ওটা তো কল্পকাহিনীই। তবে গল্পের ভিত্ গড়ে উঠেছে সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে।'

'তুমি এ কথা জানলে কী করে?' জিজ্ঞেস করল মারজোরি। 'কাউকে তো এর আগে এমনটি বলতে শুনিনি।'

শীর্ণ ঘাড় জানালার দিকে ফেরালেন মাইকেল চাচা। 'আমি এ কথা জানি কারণ আমার ভাই এবং বোনের জীবনে এরকম করুণ ঘটনা ঘটেছিল। আমিও প্রায় একই পরিণতির শিকার হতে যাচ্ছিলাম। আমার ভাই-বোন নিখোঁজ হবার বছর খানেক বাদে আমার মা'র সঙ্গে স্যার জেমসের সাক্ষাৎ হয় বেলগ্রাভিয়াতে, এক ডিনারে। সম্ভবত বছরটা ১৯০১ বা ১৯০২ সাল ছিল। মা আশা করেছিলেন স্যার জেমস ঘটনাটার উপর একটা প্রবন্ধ লিখবেন যাতে অন্যান্য বাবা-মায়েরা সাবধান হয়ে যায়। আর স্যার জেমস প্রভাবশালী লেখক বলে লোকে হয়তো তাঁর কথা শুনত, বিশ্বাসও করত। কিন্তু বুড়ো গর্দভ এমন আবেগী, এমন কল্পনা বিলাসী...মা'র কথা বিশ্বাস তো করলেনই না, উল্টো মা'র ব্যথাটাকে আমল না দিয়ে ওই ঘটনা নিয়ে বাচ্চাদের জন্যে নাটক ফেঁদে বসলেন।

'নাটকটা অত্যন্ত সফল হয়। কিন্তু মা'র সাবধানবাণী কেউ আমল দেয়নি। মা ১৯১৪ সালে সারের আর্লসউড মানসিক হাসপাতালে মারা যান। মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হয়, "চিত্তভ্রংশ" বা এরকম কী যেন।'

'এরপরে কী হলো বলো,' ব্যগ্র কণ্ঠে বলল মারজোরি। 'আমি আমার বাচ্চাকে হারিয়েছি...তোমাকে সব কথা বলতেই হবে।'

হাড্ডিসার কাঁধজোড়া ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'ফ্যাক্ট থেকে ফিকশনকে আলাদা করা বেশ কঠিন। তবু বলছি। ১৮৮০ সালের দিকে কেনসিংটন গার্ডেনসে হঠাৎ করেই অপহরণ শুরু হয়ে যায়...সবাই ছেলে শিশু, কাউকে প্রাম থেকে চুরি করা হয়, কাউকে ন্যানির কোল থেকে সরাসরি ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিটি অপহৃত-শিশুর পরে সন্ধান মেলে মৃত অবস্থায়... বেশিরভাগ কেনসিংটন গার্ডেনস এলাকায়, কয়েকটি লাশ পড়ে ছিল হাইড পার্ক এবং প্যাডিংটনে...তবে খুব দূরে কোথাও নয়। কখনও কখনও ন্যানিরা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তিনজনকে ধর্ষণ করা হয়েছিল।

'১৮৯২ সালে শিশু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এক লোক। কয়েকজন ন্যানি সাক্ষী দেয় ওই লোকই তাদেরকে ধর্ষণ করেছে এবং বাচ্চা চুরি করেছে। অন্তত তিনটি সুনির্দিষ্ট খুনের অভিযোগ আনা হয় লোকটার বিরুদ্ধে, ওল্ড বেইলিতে। ১৮৯৩ সালের ২৩ জুন তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। অক্টোবর মাসের শেষ তারিখে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তাকে।

'লোকটা ছিল পোলিশ সওদাগর। ক্যারিবিয়ানে ট্রিপ শেষে, লন্ডন ডকে জাহাজ থেকে লাফিয়ে নেমে যায় সে। নাবিকরা তার নাম জানত পিওতর। লোকটা নাকি হাসি খুশি স্বভাবের ছিল—অন্তত হাইতির পোর্ট-অ-প্রিন্সে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তার সহযাত্রীরা তাকে ওইরকমই দেখেছে। পিওতরের তিন দিন কোন খোঁজ ছিল না। জাহাজে তিন রাত পরে ফিরে আসে সে গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে। ফার্স্টমেট তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে গেলে রেগে আগুন হয়ে যায় পিওতর, প্রায়ই খিটখিটে মেজাজে থাকত সে। লন্ডনে জাহাজ নোঙর করার পরে অদৃশ্য হয়ে যায় পিওতর।

আর ফিরে আসেনি।

'জাহাজের ডাক্তার ভেবেছিলেন পিওতর ম্যালেরিয়া বাধিয়েছে। কারণ তার মুখ ছিল ছাইয়ের মত সাদা। চোখ টকটকে লাল। প্রায়ই বিড়বিড় করে আপন মনে বকত সে।'

'কিন্তু ওকে যদি ফাঁসি দেয়া হয়ে থাকে–' বলে উঠল মারজোরি।

'হ্যাঁ, ওকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল,' বললেন মাইকেল। 'প্রাণবায়ু বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তাকে ফাঁসি কাঠে। তাকে কবর দেয়া হয় ওয়াশউড স্ক্রাবস কারাগারের জমিতে। কিন্তু এক বছর পরেই কেনসিংটন গার্ডেনসে আরও বেশি করে ছেলে শিশু হারিয়ে যেতে শুরু করে, আরও বেশি ন্যানি হামলার শিকার হয় এবং প্রত্যেকের গায়ে একই রকমের খামচি ও কাটা দাগ লক্ষ করা যায় পিওতর যেভাবে হামলা চালাত তার শিকারের উপর।

'সে ন্যানিদের জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলত বেইলিং-হুক বা আঁকশি দিয়ে।'

'বেইলিং-হুক?' অস্পষ্ট গলায় প্রশ্ন করল মারজোরি।

শূন্যে হাত তুললেন মাইকেল চাচা, একটা আঙুল বাঁকানো।

'স্যার জেমস ক্যাপ্টেন হুক নামটা কোত্থেকে পেয়েছেন বলে তোমার ধারণা?'

'আমার কাপড়ও ওরকম কিছু একটা দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালেন চাচা। 'আমি সেকথাই তোমাকে বোঝাতে চাইছি। যে লোকটা তোমার ওপর হামলা করেছিল–যে উইলিয়ামকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল–সে পিওতর।'

'কী? ও তো একশো বছর আগের ঘটনা! ওই ঘটনা আবার ঘটে কী করে?'

'একই ভাবে আমাকেও ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল পিওতর ১৯০১ সালে। তখন আমিও শুয়ে ছিলাম প্রামে। আমার ন্যানি

তাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। সে হুক দিয়ে গেঁথে ফেলে ন্যানির গলা, ছিঁড়ে ফেলে তার জুগুলার ভেইন। আমার ভাই এবং বোনও তার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিল। কিন্তু ওরা নিতান্তই ছোট বলে শক্তিতে পেরে ওঠেনি। পিওতর ওদেরকে ধরে নিয়ে যায়। কয়েক হপ্তা পরে এক সাঁতারু ওদের লাশ দেখতে পায়। ভাসছিল সারপেনটাইনে।'

বৃদ্ধ নিজের মুখ ডুবিয়ে দিলেন দু'হাতের চেটোতে, ওভাবে নীরব হয়ে রইলেন ঝাড়া এক মিনিট। তারপর বলতে লাগলেন, 'আমার মা শোকে-দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কীভাবে যেন জানতে পেরেছিলেন তাঁর সন্তানদের হত্যাকারীর পরিচয়। প্রতিটি বিকেলে ঘুরে বেড়াতেন তিনি কেনসিংটন গার্ডেনসে, প্রায় প্রতিটি মানুষের পিছু নিতেন। এবং অবশেষে– তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মা'র। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল সে, লক্ষ করছিল বেঞ্চিতে বসা দুই ন্যানিকে। মা সোজা এগিয়ে যান তার দিকে, চ্যালেঞ্জ করে বসেন তাকে। মুখের উপর বলে দেন মা জানেন তার পরিচয়; জানেন সে-ই তাঁর সন্তানের হত্যাকারী।

'সে কি জবাব দিয়েছিল জানো? মা'র সেই কথা জীবনে ভুলব না আমি। মনে পড়লে আজও শিউরে ওঠে গা। সে বলেছিল, "আমি কোনদিন মা কী জিনিস জানতে পারিনি। বাবাকেও কোনদিন চোখে দেখিনি। আমাকে কোন মেয়ে কোনদিন ছেলে বলে গ্রাহ্য করেনি। তবে হাইতির বৃদ্ধা বলেছে আমি সারা জীবন তরুণ থাকতে পারব, যতদিন ইচ্ছা বেঁচে থাকব যদি তাকে সবসময় বাচ্চা ছেলেদের আত্মা বাতাসে উড়িয়ে উপহার দিই। আমি তা-ই করছি। আমি বাচ্চাগুলোকে চুমু খাই, ওদের শরীর থেকে বের করে আনি আত্মা, উড়িয়ে দিই বাতাসে। আত্মা ভাসতে ভাসতে চলে যায় হাইতিতে"।'

মাকে সে আরও বলেছিল, 'তোমার সন্তানের আত্মারা দূর

দেশে ভেসে গেলেও এখনও বেঁচে উঠতে পারে। অবশ্য তুমি যদি চাও। কবরে গিয়ে তাদের নাম ধরে ডাকলেই তারা চলে আসবে তোমার কাছে। শুধু একবার ডাক দিলেই হলো।

'মা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কে তুমি? কি তুমি?" সে জবাব দিয়েছিল। 'প্যান।' পোলিশ ভাষায় প্যান অর্থ মানুষ। মা তখন তার নাম দেন "পিওতর প্যান।" আর স্যার জেমস ব্যারি ওখান থেকে ধার করেন তাঁর উপন্যাসের নাম।'

মারজোরি আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল বৃদ্ধের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'এরপরে তোমার মা কী করলেন? তোমার ভাই-বোনকে ডেকে পাঠাননি?'

মাথা নাড়লেন মাইকেল চাচা। 'তিনি গ্রানিটের ভারি স্ল্যাব দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন কবর। তারপর অন্যান্য মায়েদেরকে পিওতর প্যান সম্পর্কে সাবধান করে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু কেউ শোনেনি তাঁর কথা।'

'তিনি সত্যি বিশ্বাস করতেন তাঁর সন্তানদেরকে আবার জীবিত ফিরিয়ে আনা যেত?'

'আমার তাই ধারণা। তবে মা সবসময় আমাকে বলতেন—আত্মাহীন জীবনের কী দাম আছে?'

মারজোরি সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইল তার চাচার পাশে। চাচার মাথাটা ঢলে পড়ল এক পাশে, নাক ডাকতে শুরু করলেন তিনি।

চ্যাপেলের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে সে, জানালার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো সূর্যের আলো তার মুখটিকে আশ্চর্য ফর্সা করে তুলেছে। পরনে তার কালো পোশাক, মাথার হ্যাটটিও কালো, হাতে ধরা হ্যান্ডব্যাগটিও তাই। উইলিয়ামের সাদা কফিনটি খোলা, সাদা মখমলের বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে বাচ্চাটা, চোখ বোজা, ছোট্ট পাপড়ি কুঁকড়ে আছে কাগজের মত সাদা গালের উপর, ঠোঁট জোড়া সামান্য ফাঁক, যেন এখনও দম নিচ্ছে সে।

কফিনের অপর পাশে জ্বলছে মোমবাতি; একজোড়া লম্বা ফ্লাওয়ার ভাসে সাদা গ্ল্যাডিওলি। গাড়ি চলাচলের মৃদু যান্ত্রিক শব্দ, মাঝে মাঝে মাটির নীচ দিয়ে ছুটে যাওয়া সেন্ট্রাল লাইন টিউব ট্রেনের গুমগুম আওয়াজ ছাড়া চ্যাপেল অদ্ভুত নীরব।

মারজোরি টের পেল তার বুক ধুকপুক করছে।

আমার বাচ্চা, ভাবল সে। আমার ছোট্ট সোনা বাবু।

কফিনের কাছে চলে এল সে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর হাত বাড়িয়ে নেড়ে দিল উইলিয়ামের রেশমের মত কোঁকড়ানো চুল। কী নরম! বুকে তীব্র ব্যথা জাগল মারজোরির।

'উইলিয়াম,' শ্বাস বন্ধ করে ডাকল ও।

বাচ্চাটা আগের মতই স্থির হয়ে রইল। স্থির এবং ঠাণ্ডা। কোন নড়াচড়া নয়, নেই শ্বাসপ্রশ্বাসের লক্ষণ।

'উইলিয়াম,' আবার ডাকল মারজোরি। 'উইলিয়াম, আমার সোনা, ফিরে এসো আমার কাছে। আমার কাছে চলে এসো, মি. বিল।' নড়ল না বাচ্চা। শ্বাসও ফেলল না।

আরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মারজোরি। নিজেকে এখন ধিক্কার দিচ্ছে মাইকেল চাচার গল্পটা বিশ্বাস করেছিল বলে। বুড়ো আসলে পাগল। পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোল ও। শেষবারের মত ফিরে দেখল উইলিয়ামকে, তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে, পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা।

খিলটা মাত্র লাগিয়েছে, এমন সময় নীরবতা খান খান হয়ে গেল উঁচু স্বরের বিকট ও ভয়ঙ্কর এক চিৎকারে যা জীবনে শোনেনি মারজোরি।

কেনসিংটন গার্ডেনসে, গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, রোগা একটা লোক। কান পেতে কিছু শুনবার চেষ্টা করছে। এক সময় হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। বাতাস বয়ে নিয়ে এল শিশুর চিৎকার।

কান পেতে চিৎকারটা শুনল সে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। একটু পরে দেখা গেল এক তরুণী একটি প্রাম ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। প্রামের ভিতরে ক্ষীণ নজরে পড়ে হাত-পা নাড়ছে একটি দুধের শিশু।

সে অপেক্ষা করছে।

অপেক্ষা করছে, আরও কাছে আসুক ওরা।

মূল গল্পঃ গ্রাহাম মাস্টারটনের 'দ্য টেকিং অভ মিস্টার বিল'

ভয়

ছোট্ট ছোট্ট জিনিস আমাকে ভীত করে তোলে। রোদ। ঘাসের উপরে গাঢ় ছায়া। সাদা গোলাপ। লাল চুলের শিশু। আর একটা নাম–হ্যারি। কত সাধারণ একটা নাম!

ক্রিস্টিন যখন প্রথম নামটা বলল আমাকে, আমার গা শিউরে উঠেছিল।

ওর বয়স পাঁচ, মাস তিনেক বাদে ভর্তি হবে স্কুলে। এক সুন্দর, উষ্ণ বিকেলে বরাবরের মত বাগানে খেলা করছিল ক্রিস্টিন। দেখলাম ঘাসের উপর পেট দিয়ে শুয়ে আছে ও, ডেইজি ফুল ছিঁড়ে মালা গাঁথছে মনের আনন্দে। ওর ম্লান লাল চুলে রোদ ঝলসাচ্ছে, ত্বক আশ্চর্য সাদা লাগছে। বড় বড় নীল চোখ জোড়া গভীর মনোযোগের কারণে ঈষৎ বিস্ফারিত।

হঠাৎ সাদা গোলাপের ঝাড়ের দিকে চোখ তুলে চাইল ক্রিস্টিন। ঝোপটার ছায়া পড়েছে ঘাসে। হাসল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, আমি ক্রিস্টিন,' বলল সে। সিধে হলো। ধীর পায়ে হেঁটে এগোল ঝোপের দিকে। পরনের নীল সূতির স্কার্টটা উরু ছুঁয়েছে। দ্রুত লম্বা হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা।

'থাকি মাম্মি আর ড্যাডির সাথে,' পরিষ্কার গলা শোনা গেল ওর। তারপর একটু বিরতি দিয়ে, 'কিন্তু ওরাই আমার মাম্মি আর ড্যাডি।'

ঝোপের ছায়ার মধ্যে এখন ক্রিস্টিন। যেন আলোর পৃথিবী থেকে ঢুকে পড়েছে আঁধারে। কেমন অস্বস্তি লেগে উঠল আমার, জানি না কেন, ডাক দিলাম ওকে।

'ক্রিস, কী করছ তুমি?'

'কিছু না,' অনেক দূর থেকে যেন ভেসে এল কণ্ঠটি।

'ঘরে এসো। বাইরে অনেক রোদ।'

'বেশি রোদ না।'

'ঘরে এসো, ক্রিস।'

ও বলল, 'আমাকে এখন যেতে হবে। বিদায়,' বাড়ির দিকে পা বাড়াল মন্থর ভঙ্গিতে।

'ক্রিস, কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

'হ্যারি।'

'হ্যারি কে?'

'হ্যারি।'

ও আর কিছু বলল না। আমি ওকে কেক আর দুধ খাওয়ালাম, ঘুমাতে যাবার আগ পর্যন্ত পড়ে শোনালাম বই। শুনতে শুনতে বাগানের দিকে চোখ ফেরাল ক্রিস্টিন। হেসে কাকে যেন উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল। ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার পরে স্বস্তির শ্বাস ফেললাম।

জিম বাড়ি ফেরার পরে ওকে রহস্যময় 'হ্যারি' সম্পর্কে বললাম। হেসেই উড়িয়ে দিল সে আমার কথা।

'তোমার সঙ্গে দুষ্টুমি শুরু করেছে ও।' বলল জিম।

'মানে?'

'বাচ্চারা কল্পনায় এরকম নানা সঙ্গী-সাথী জোগাড় করে। কেউ কেউ তাদের পুতুলের সঙ্গে কথা বলে। ক্রিসের তো আবার পুতুল-টুতুলের প্রতি কোন কালেই আগ্রহ ছিল না। ওর ভাই-বোন নেই, নেই সমবয়সী কোন বন্ধু। তাই কল্পনায় একজনকে নিজের সাথী করে নিয়েছে। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

'কিন্তু নির্দিষ্ট কোন নাম কেন বেছে নেবে ও?'

শ্রাগ করল জিম। 'বাচ্চারা এরকম কত কিছুই তো করে। এ নিয়ে এত দুশ্চিন্তার কোন মানে হয় না।'

'না, ঠিক দুশ্চিন্তা নয়। ওর প্রতি আরেকটু খেয়াল রাখার প্রয়োজন বোধ করছি। ওর আসল মায়ের চেয়েও বেশি।'

'জানি আমি। কিন্তু ক্রিস ঠিকই আছে। ও চমৎকার একটি মেয়ে। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, বুদ্ধিমতী। এর সমস্ত ক্রেডিট তোমার।'

'তোমারও।'

'ইনফ্যাক্ট, আমরা বাবা-মা হিসেবে মন্দ নই।'

'এবং খুব বিনয়ী।' বলে দু'জনে হেসে উঠলাম একসাথে। জিম আমাকে চুমু খেল। আমার মন শান্ত হলো।

তবে পরদিন সকাল পর্যন্ত।

আজও প্রখর রোদ চমকাচ্ছে ছোট লনটিতে, সাদা গোলাপ ঝাড়ের গায়ে। ক্রিস্টিন পা মুড়ে বসেছে ঘাসে, চোখ ঝাড়ের দিকে। হাসছে। 'হ্যালো,' বলল সে। 'জানতাম তুমি আসবে...কারণ তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তোমার বয়স কত?...আমি পাঁচে পা দিয়েছি...আমি বাচ্চা মেয়ে নই। আমি শিগ্গিরি ইশ্কুলে ভর্তি হব, নতুন ড্রেস পরব। সবুজ জামা। তুমি ইশ্কুলে যাও?...তারপর কী করো?' এক মুহূর্ত নীরব থাকল সে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, শুনছে, তলিয়ে গেছে আলাপচারিতায়।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখে গা হিম হয়ে এল আমার। 'বোকার মত কিছু ভেবে বোসো না। অনেক বাচ্চারই কাল্পনিক সঙ্গী থাকে।' নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। 'কিছুই ঘটছে না, তুমি কিছুই দেখছ না বা শুনছ না এমন ভাব করলেই হয়। নির্বোধের মত কিছু করে বোসো না।'

কিন্তু আমি ডাক দিলাম ক্রিসকে দুধ খাওয়ার জন্য। সাধারণত এত তাড়াতাড়ি ওকে দুধ খাওয়াই না আমি।

'তোমার দুধ রেডি, ক্রিস। চলে এসো।'

'এক মিনিট,' জবাব শুনে অবাক লাগল। ও দুধ খেতে খুব পছন্দ করে স্যান্ডউইচ ক্রীম বিস্কিট দিয়ে। ডাকলেই চলে আসে।

'এখুনি আসো, সোনা,' বললাম আমি।

'হ্যারিকে নিয়ে আসি?'

'না!' চিৎকারটা এতই কর্কশ শোনাল যে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম।

'গুডবাই, হ্যারি। তোমাকে নিয়ে যেতে পারছি না বলে দুঃখিত। কিন্তু আমাকে এখন দুধ খেতে যেতে হবে।' বলে লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকল ক্রিস।

'হ্যারিকে কেন দুধ খেতে ডাকলে না?' রীতিমত চ্যালেঞ্জ করে বসল আমার মেয়ে।

'হ্যারিটা কে সোনা?'

'হ্যারি আমার ভাই।'

'কিন্তু ক্রিস, তোমার কোন ভাই নেই। ড্যাডি আর মাম্মির একটাই মাত্র সন্তান, একটি মাত্র মেয়ে, আর সে হলে তুমি। হ্যারি তোমার ভাই হতে পারে না।'

'হ্যারি আমার ভাই। ও আমাকে তাই বলেছে।' দুধের গ্লাসে মুখ নামাল ও, চুমুক দিল। মুখ তুলল উপরের ঠোঁটে দুধের সাদা রেখা নিয়ে। তারপর থাবা মেরে তুলে নিল বিস্কিট। যাক 'হ্যারি' অন্তত ওর খিদে নষ্ট করতে পারেনি।

দুধ খাওয়া শেষ হলে আমি বললাম, 'আমরা এখন শপিং করতে যাব, ক্রিস। আমার সঙ্গে যাবে?'

'না। আমি হ্যারির সঙ্গে থাকব।'

'তা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ।'

'হ্যারি যেতে পারবে?'

'না।'

হ্যাট আর গ্লাভস পরার সময় লক্ষ করলাম আমার হাত কাঁপছে। আজকাল ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে ঘরে। যেন শীতল একটা ছায়া ঘিরে আছে বাড়িটাকে সূর্যালোক আড়াল করে। সুবোধ বালিকাটির মত আমার সাথে বেরিয়ে পড়ল ক্রিস। তবে রাস্তা

দিয়ে হাঁটার সময় ঘুরে হাত নাড়ল সে অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ্য করে।

এ ঘটনা জিমকে জানালাম না আমি। বললে আগের দিনের মত লেকচার শুনিয়ে দেবে সে আমাকে। কিন্তু ক্রিস্টিনের 'হ্যারি' ফ্যান্টাসি দিনের পর দিন চলতে লাগল, সেই সাথে চাপ বাড়ল আমার স্নায়ুতে। গ্রীষ্মের লম্বা দিনগুলো এখন আমার চোখে বিষের মত, চাতকের মত অপেক্ষা করছি ধূসর মেঘ ভর্তি আকাশ আর বৃষ্টির জন্য। বাগানে ক্রিস্টিনের গলা শুনলেই আজকাল কেঁপে উঠি আমি। 'হ্যারি'র সাথে সে বিরামহীন বকবক করে চলে।

এক রোববার জিম সব কিছু শোনার পরে মন্তব্য করল, 'আমি তোমাকে আগেও বলেছি এখনও বলছি ক্রিস কল্পনায় তার একজন সঙ্গী খুঁজে নিয়েছে।'

'ওর ভাষাও বদলে যাচ্ছে,' বললাম আমি। 'খানিকটা ককনি অ্যাকসেন্টে কথা বলে আমার মেয়ে।'

'মাই ডিয়ারেস্ট, লন্ডনের প্রতিটি বাচ্চাই খানিকটা ককনি অ্যাকসেন্টে কথা বলে। স্কুলে যাবার পরে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে মিশে তো ওর উচ্চারণ আরও বাজে হয়ে উঠবে।'

'আমরা তো ককনি অ্যাকসেন্টে কথা বলি না। এরকম উচ্চারণ ও শিখল কোত্থেকে? আর কার থেকে ও এ উচ্চারণ শিখবে ওই ইয়েটা ছাড়া...' হ্যারির নামটা মুখে এল না আমার।

'দুধঅলা, ঝাড়ুদার, কয়লাঅলা–আরও নাম শুনতে চাও?'

'চাই না,' তিক্ত একটা হাসি দিয়ে চুপ হয়ে গেলাম আমি।

'তবে,' বলল জিম। 'আমি কিন্তু ওর উচ্চারণে কোন ককনির প্রভাব লক্ষ করিনি।'

'আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় সে ওভাবে উচ্চারণ করেও না। শুধু বলে ওর–ওর সঙ্গে কথা বলার সময়।'

'অর্থাৎ হ্যারি। এই হ্যারির ব্যাপারে আমার বেশ কৌতূহল হচ্ছে। চলো, একদিন খুঁজে দেখি সত্যি এ নামে কেউ আছে

কিনা?'

'না!' আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। 'ও কথা আর মুখেও এনো না। ওটা আমার দুঃস্বপ্ন। আমার জীবন্ত দুঃস্বপ্ন। ওহ্, জিম। আমি আর সইতে পারছি না।'

বিস্মিত দেখাল ওকে। 'এই হ্যারি দেখছি তোমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে!'

'আসলেই তাই। সারাদিন আর রাত আমাকে অনর্গল শুনতে হচ্ছে "হ্যারি ওটা," "হ্যারি এটা"। "হ্যারি অমুক বলেছে?" "হ্যারি তমুক ভাবছে।" "হ্যারিকে এটা দিই?" "হ্যারিকে নিয়ে আসি?" তুমি অফিসে থাকো বলে এ যন্ত্রণা তোমাকে সইতে হয় না। কিন্তু এটার সঙ্গে আমাকে বাস করতে হচ্ছে। আমি–আমি ভয় পাচ্ছি, জিম। ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর।'

'তোমার মানসিক বিশ্রামের জন্যে কী করা দরকার জানো?'

'কী?'

'ক্রিসকে নিয়ে কাল ড. ওয়েবস্টারের কাছে যাবে। ক্রিসের সঙ্গে উনি কথা বলুন।'

'ক্রিস কি অসুস্থ–মানে মানসিক ভাবে...?'

'গুড হেভেনস, নো! তবে প্রফেশনাল অ্যাডভাইসটা এখন দরকার।'

পরদিন ক্রিসকে নিয়ে গেলাম ড. ওয়েবস্টারের কাছে। ওকে ওয়েটিং-রুমে বসিয়ে ওয়েবস্টারের হ্যারির ব্যাপারে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলাম। সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন তিনি, তারপর বললেন, 'এটা একটা অদ্ভুত কেস, মিসেস জেমস। তবে অস্বাভাবিক নয়। কাল্পনিক সঙ্গী কোন কোন বাচ্চার কাছে এমন বাস্তব হয়ে ওঠে যে বাবা-মা'র আত্মা শুকিয়ে যায় ভয়ে। এরকম ঘটনা বহু দেখেছি। আপনার মেয়েটি বোধহয় একা থাকে, তাই না?'

'ওর কোন বন্ধু নেই। আমরা নতুন এসেছি ওই এলাকায়।

তবে স্কুলে যেতে শুরু করলে আর বন্ধুর অভাব হবে না।'

'ও স্কুলে যাবার পরে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে যখন মিশতে থাকবে, দেখবেন ফ্যান্টাসিগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রতিটি শিশুরই সমবয়েসী সঙ্গী সাথী দরকার। না পেলে সে নিজেই কোন সঙ্গী আবিষ্কার করে বা বানিয়ে নেয়। বয়সী কিংবা বুড়োরা আপন মনে নিজেদের সাথে কথা বলে। এর মানে এই নয় যে তারা পাগল। কারও সঙ্গে কথা বলার দরকার হয় বলেই এমনটা করে। শিশু আরও বেশি প্রাকটিকাল। নিজে নিজে কথা বলার চেয়ে কল্পনায় কোন সঙ্গী সে তৈরি করে। আমার মনে হয় না এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু আছে।'

'আমার স্বামীও তাই বলেছে।'

'ঠিকই বলেছেন তিনি। তবে ক্রিস্টিনকে যেহেতু নিয়ে এসেছেন, ওর সঙ্গে একটু কথা বলি। তবে আমাদের আলাপচারিতায় আপনার না থাকলেও চলবে।'

আমি ওয়েটিংরুমে গেলাম ক্রিসের কাছে। সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল, 'হ্যারি অপেক্ষা করছে।'

'কোথায়, ক্রিস?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করলাম।

'ওই তো। গোলাপের ঝাড়ের ধারে।'

ডাক্তার তাঁর বাগানে গোলাপের ঝাড় বানিয়েছেন।

'ওখানে কেউ নেই,' বললাম আমি। ক্রিস কটমট করে তাকাল আমার দিকে। 'ড. ওয়েবস্টার তোমার সঙ্গে কথা বলবেন, সোনা।' ওর চাউনিতে এমন কিছু একটা ছিল, কথা বলার সময় গলা কেঁপে গেল আমার। 'ওনাকে তো তুমি চেনোই। চিকেন পক্স থেকে সেরে ওঠার পরে তোমাকে মিষ্টি খেতে দিয়েছিলেন, মনে নেই?'

'মনে আছে।' বলল ক্রিস। সোৎসাহে পা বাড়াল ডাক্তারের সার্জারীর দিকে। আমি অস্থিরচিত্তে ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওদের অস্পষ্ট গলা ভেসে আসছে। ডাক্তার খিক খিক

করে হাসলেন। ক্রিস্টিন জোর হাসিতে ফেটে পড়ল। ডাক্তারের সাথে যেরকম আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলছে ও আমার সঙ্গে সেভাবে কখনও বলে না।

ওরা ঘর থেকে বেরুল। ডাক্তার বললেন, 'আপনার মেয়ের কোন সমস্যা নেই। ওর মনটা শুধু কল্পনায় ভরা। একটা কথা মিসেস জেমস, ওর সঙ্গে হ্যারির ব্যাপারে আলোচনা করুন। আপনার উপরে যেন সে আস্থা রাখতে পারে। আপনি ওর এই 'ভাইটি'র ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করছেন, শুনেছি আমি। তাই ক্রিস্টিন হ্যারি সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। হ্যারি কাঠের খেলনা বানাতে পারে, তাই না, ক্রিস?'

'জ্বী। হ্যারি কাঠের খেলনা বানাতে পারে।'

'সে লিখতে পড়তেও জানে, না?'

'এ ছাড়া সাঁতার কাটতে পারে, পারে গাছে চড়তে এবং ছবি আঁকতে। হ্যারি সব পারে। ও খুব ভাল ভাই।' ক্রিসের ছোট্ট মুখখানা জ্বলজ্বল করে উঠল।

ডাক্তার আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন। 'হ্যারি ওর কাছে খুব ভাল একটি ভাই। ক্রিসের মত তারও মাথায় লাল চুল, তাই না?' 'হ্যারির মাথায়ও লাল চুল আছে,' গর্বের সুর ক্রিসের কণ্ঠে। 'আমার চুলের চেয়েও লাল। ড্যাডির মতই প্রায় লম্বা সে, শুধু রোগা। মাম্মি, তোমার সমান লম্বা হ্যারি। ওর বয়স চোদ্দ। বলেছে বয়সের তুলনায় সে নাকি বেশি লম্বা হয়ে গেছে। এ কথার মানে কী?'

'বাড়ি যাবার পথে মাম্মি তোমাকে এ কথার মানে বুঝিয়ে দেবেন,' বললেন ড. ওয়েবস্টার। 'এখন বিদায়। মিসেস জেমস। দুশ্চিন্তা করবেন না। ও আবোল তাবোল যা বলে বলুক। গুডবাই ক্রিস। হ্যারিকে আমার ভালবাসা দিয়ো।'

'ও তো ওখানে,' ডাক্তারের বাগানের দিকে আঙুল তুলে দেখাল ক্রিস। 'আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।'

গলা ছেড়ে হাসলেন ড. ওয়েবস্টার। এদেরকে সংশোধন করা সম্ভব নয়, তাই না? আমি এক মায়ের কথা জানি যার বাচ্চারা কল্পনায় গোটা একটি উপজাতির দল আবিষ্কার করে বাড়িতে নানা রকম পূজা-অর্চনা শুরু করে দিয়েছিল। সেদিক থেকে আপনি ভাগ্যবতী, মিসেস জেমস!'

নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। মনে প্রাণে আশা করলাম ক্রিস স্কুলে যেতে শুরু করলে তার মাথা থেকে হ্যারির ভূতটা নেমে যাবে।

ক্রিস আমার আগে আগে ছুটে চলেছে। এমন ভাবে পাশ ফিরে তাকাচ্ছে যেন সঙ্গে কেউ আছে। একটি ভয়ঙ্কর সেকেন্ডের জন্য আমি ফুটপাতে ওর ছায়ার পাশে আরেকটি লম্বা, সরু ছায়া দেখতে পেলাম–ছেলেদের ছায়া। পরের মুহূর্তে ওটা উধাও। ছুটে গিয়ে ক্রিসের হাত চেপে ধরলাম। বাকি রাস্তাটা আর মুঠো ছাড়লাম না।

আমাদের বাড়িটিতে যথেষ্ট নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু এ গরমেও বাড়িটি আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা। আমি আর এক মুহূর্তের জন্যও ক্রিসকে চোখের আড়াল হতে দিলাম না। ও আমার চোখের সামনেই আছে, কিন্তু বাস্তবে যেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমার বাড়িতে আমার বাচ্চা ক্রমে অচেনা একজনে পরিণত হচ্ছে।

ক্রিসকে দত্তক নেওয়ার পরে এই প্রথম সিরিয়াসভাবে প্রশ্নগুলো মাথায় এল আমার: কে ও? কোত্থেকে এসেছে ও? ওর আসল বাবা-মা কে? যাকে আমি মেয়ে হিসাবে দত্তক নিয়েছি এর প্রকৃত পরিচয় কী? কে ক্রিস্টিন?

আরেকটি হপ্তা গেল। সারা হপ্তা শুধু হ্যারি আর হ্যারির গল্পই শুনতে হলো। স্কুলে যাবার আগের দিন ক্রিস জানাল সে স্কুলে যাবে না।

'অবশ্যই যাবে।' বললাম আমি। 'তোমার স্কুলে ভর্তি হবার

বয়স হয়েছে। ওখানে তোমার বয়সী অনেক বন্ধু পাবে।'

'হ্যারি বলেছে সে যেতে পারবে না।'

'স্কুলে হ্যারিকে দরকার হবে না তোমার। সেই–' ডাক্তারের উপদেশ মনে পড়ে গেল, অনেক কষ্টে গলার স্বর শান্ত রাখলাম। '–মানে স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে তার বয়স অনেক বেশি। ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যে চোদ্দ বছরের একটা বুড়ো ছেলের খুবই অস্বস্তি লাগবে।'

'আমি হ্যারিকে ছাড়া স্কুলে যেতে পারব না। আমি হ্যারির সঙ্গে থাকব।' ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল ও। 'ক্রিস, কান্না বন্ধ করো! বন্ধ করো বলছি!' ঠাস করে ওর হাতে সজোরে চড় বসিয়ে দিলাম। সাথে সাথে থেমে গেল কান্না। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। বড় বড় নীল চোখ জোড়া বিস্ফারিত এবং ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। বড়দের মত ভীতিকর চাউনি। ছমছম করে উঠল গা।

ক্রিস বলল, 'তুমি আমাকে ভালবাস না। হ্যারি আমাকে ভালবাসে। ও আমাকে চায়। বলেছে ওর সঙ্গে আমি যেতে পারি।'

'এসব কথা আমি আর শুনতে চাই না!'

চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, পরক্ষণে নিজের উপরে রাগ হলো ছোট একটা বাচ্চার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করার জন্য। আমার বাচ্চা– হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম আমি। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে ব্যাকুল গলায় ডাকলাম, 'ক্রিস, সোনা। এসো।'

ধীর পায়ে এগিয়ে এল সে। 'আমি তোমাকে ভালবাসি,' বললাম আমি। 'তুমি স্কুলে গেলে আমি খুব খুশি হব।'

'স্কুলে গেলে হ্যারিকে আর পাব না।'

'অন্য অনেক বন্ধু পাবে।'

'আমি অন্য কাউকে চাই না। শুধু হ্যারিকে চাই।' আবার চোখ ছাপিয়ে জল এল। আমার কাঁধে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে। আমি ওকে জোরে জড়িয়ে ধরলাম।

'তুমি ক্লান্ত, সোনা। চলো, ঘুমাতে যাবে।'

মুখে জলের শুকনো দাগ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ক্রিস।

তখনও দিনের আলো ছিল। আমি জানালার ধারে গেলাম পর্দা ফেলে দিতে। বাগানে সোনালি ছায়া আর রোদের লম্বা ফালি। তারপর, আবার স্বপ্নের মত, সাদা গোলাপ ঝাড়ের পাশে ছায়া ফেলল লম্বা, পাতলা একটি শরীর। পাগলিনীর মত ঝট্ করে জানালা খুলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হ্যারি! হ্যারি!'

গোলাপের মাঝে লালচে ঝলক দেখলাম যেন এক মুহূর্তের জন্য, লালচে, কোঁকড়ানো চুলের একটা মাথা। তারপর আর কিছু নেই।

রাতে জিমকে ক্রিস্টিনের কথা বললাম। সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে। 'বেচারী। স্কুলে যাবার সময় সব বাচ্চাই এরকম কান্নাকাটি করে। একবার স্কুলে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুদিন পরে আস্তে আস্তে হ্যারির কথাও ভুলে যাবে।'

'হ্যারি চায় না ও স্কুলে যাক।'

'অ্যাই! তুমিও দেখছি হ্যারিকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছ।'

'কখনও কখনও করি।'

'বুড়ো বয়সে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস?' ঠাট্টা করল জিম।

'হ্যারি ভূত-প্রেত নয়,' বললাম আমি। 'একটা কিশোর মাত্র। যার কোন অস্তিত্ব নেই শুধু ক্রিস্টিনের কাছে ছাড়া। আর ক্রিস্টিন কে?'

'ওভাবে বলছ কেন?' কঠিন শোনাল জিমের কণ্ঠ। 'ক্রিসকে দত্তক নেয়ার সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ও আমাদের আপন সন্তানের মত বেড়ে উঠবে। আমরা অতীত নিয়ে মাথা ঘামাব না। কোন দুশ্চিন্তা করব না। কোন রহস্য নিয়ে ভাবব না। আমরা ভাবব ক্রিস আমাদের রক্ত মাংসের সন্তান। অথচ তুমি এখন প্রশ্ন তুলছ ক্রিস্টিন কে! ও আমাদের মেয়ে–এ কথাটা ভুলে যেয়ো না।'

জিমকে আগে কখনও এভাবে রেগে উঠতে দেখিনি। তাই

পরদিন ক্রিস স্কুলে থাকার সময় কী করব সে ব্যাপারটা গোপন করে গেলাম ওর কাছে।

পরদিন সকালে ক্রিসকে চুপচাপ আর গম্ভীর দেখলাম। জিম ওর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করে মন ভাল করে দিতে চাইল। কিন্তু সেদিকে পাত্তা না দিয়ে ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তারপর একসময় বলল, 'হ্যারি চলে গেছে।'

'হ্যারিকে তোমার দরকার নেই। তুমি এখন স্কুলে যাবে।' বলল জিম।

ক্রিস ওর দিকে সেই ঘৃণামিশ্রিত বড়দের মত চাউনি দিল।

স্কুলে যাবার পথে মেয়ের সঙ্গে কোন কথা হলো না আমার। আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। তবু যে ওকে স্কুলে নিয়ে যেতে পারছি তাই যথেষ্ট। ওকে আমি হারিয়ে ফেলছি এরকম বিচিত্র অনুভূতি জাগল মনে। প্রতিটি মারই হয়তো তার বাচ্চাকে প্রথম স্কুলে নিয়ে যাবার সময় এরকম অনুভূতি হয়। স্কুলে ভর্তি হওয়া মানে শিশুর শৈশবকালের সমাপ্তি, বাস্তব জীবনে প্রবেশ। জীবনের নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, অচেনা দিকের সাথে পরিচয়। স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে ওকে বিদায় চুম্বন করে বললাম, 'তুমি আজ স্কুলের অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে ডিনার করবে, ক্রিস। তিনটার সময় ছুটি হলে তোমাকে নিতে আসব।'

'আচ্ছা, মাম্মি,' আমার হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ও। নার্ভাস অন্যান্য বাবা-মাদের সাথে চেহারায় ভয় আর দুশ্চিন্তা নিয়ে বাচ্চারা স্কুলে আসতে শুরু করেছে। সুন্দর চুলের, সাদা লিনেনের ড্রেস পরা এক সুন্দরী তরুণী হাজির হলো স্কুল-গেটে। নতুন বাচ্চাদেরকে জড়ো করে ওদের নিয়ে স্কুল অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় তার মুখে সহানুভূতির হাসি ফুটল। 'আমরা ওর ঠিক মত যত্ন নেব।'

ক্রিসকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না জেনে হালকা হয়ে গেল মন। এবার আমার গোপন অভিযানে বেরিয়ে পড়া চলে। শহরে

যাবার বাসে উঠে পড়লাম। নেমে পড়লাম বিশালাকৃতির, বিষণ্ন চেহারার বিল্ডিংটির সামনে। পাঁচ বছর আগে জিমকে নিয়ে একবার এসেছিলাম এ দালানে। এরপর আর আসার দরকার হয়নি। বিল্ডিং-এর টপ ফ্লোরে গ্রেথর্ন অ্যাডাপশন সোসাইটির অফিস। আমি পাঁচতলায় উঠে এলাম। রঙচটা, পরিচিত দরজায় কড়া নাড়লাম। এক মহিলা, আগে কখনও দেখিনি, ভিতরে আসতে বলল আমাকে। 'মিস ক্লেভারের সঙ্গে দেখা করতে পারি? আমি মিসেস জেমস।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'না। তবে ব্যাপারটা খুব জরুরী।'

'আচ্ছা, দেখছি।' বলে ভিতরের ঘরে ঢুকল সে। একটু পরেই ফিরে এল।

'মিস ক্লেভার আপনাকে যেতে বলেছেন, মিসেস জেমস।'

মিস ক্লেভার রোগা, লম্বা, ধূসর চুলের হাসি মুখের এক মহিলা। তাঁর চেহারা থেকে করুণা ঝরে পড়ছে, ভুরুতে অসহ্য ভাঁজ। আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'মিসেস জেমস, কতদিন পরে দেখা! ক্রিস্টিন কেমন আছে?'

'ভাল আছে, মিস ক্লেভার। আপনার সময় নষ্ট না করে সরাসরি কাজের কথায় চলে আসি। আমি জানি দত্তক সন্তানদের জন্মবৃত্তান্ত আপনারা গোপন করে রাখেন। কিন্তু ক্রিস্টিনের আসল পরিচয় জানা আমার খুবই দরকার।'

'দুঃখিত, মিসেস জেমস,' শুরু করলেন তিনি। 'আমাদের নিয়ম আছে...'

'প্লীজ, গল্পটা আগে শুনুন। তারপর বুঝতে পারবেন কেন ক্রিস্টিনের জন্ম নিয়ে তথ্য চাইছি।'

হ্যারির ঘটনা বললাম তাঁকে।

সব শুনে তিনি মন্তব্য করলেন, 'খুব অদ্ভুত ঘটনা। খুবই অদ্ভুত। মিসেস জেমস, এই প্রথম আমি নিয়ম ভাঙছি।

ক্রিস্টিনের জন্ম লন্ডনের এক হত দরিদ্র অঞ্চলে। ওদের সংসারে ছিল চার সদস্য বাবা, মা, ভাই ও ক্রিস্টিন।'

'ভাই?'

'হ্যাঁ। তার বয়স যখন চোদ্দ তখন ঘটনাটা ঘটে।'

'কী ঘটেছিল?'

'গোড়া থেকে বলি। বাবা-মা ক্রিস্টিনের জন্ম হোক তা চায়নি। একটা পুরানো বাড়ির চিলেকোঠার ঘিঞ্জি ঘরে গাদাগাদি করে বাস করত গোটা পরিবার। তিনজনেই ঠিক মত শোয়ার জায়গা হত না, আর একটা বাচ্চা যোগ হওয়ায় খুবই মুশকিলে পড়তে হয়েছিল ওদেরকে। মা-টা ছিল পাগলাটে টাইপের, মোটাসোটা, নোংরা আর অত্যন্ত অসুখী একজন মানুষ। মেয়ের প্রতি তার কোন আগ্রহই ছিল না। তবে ভাইটি প্রচণ্ড ভালবাসত তার বোনকে। স্কুল বাদ দিয়ে সে বোনের দেখাশোনা করত।

'একটা গুদাম ঘরে স্বল্প বেতনে কাজ করত বাপ। ও দিয়ে সংসার চলত না। তারপর একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। অনেকদিন অসুস্থ ছিল বলে চাকরিটাও হারায়। ওই গুমোট ঘরে দিনের পর দিন স্ত্রীর গঞ্জনা আর বাচ্চার কান্না সহ্য করতে হয়েছে তাকে অসুস্থ শরীরে। আমি এ সমস্ত তথ্য পেয়েছি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে। শুনেছি ভয়ানক দুঃসময় যাচ্ছিল ওদের। এত দারিদ্র্য সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠেছিল বেকার বাপের জন্য।

'তারপর একদিন খুব ভোরে, ওই বাড়ির নীচতলার এক মহিলা দেখতে পায় তার জানালার পাশ দিয়ে কী যেন একটা উপর থেকে পড়ল। পরক্ষণে দড়াম করে শব্দ, মহিলা বাইরে এসে দেখে উপরতলার পরিবারের ছেলেটি পড়ে আছে মাটিতে। ক্রিস্টিনকে জড়িয়ে রেখেছে সে। ছেলেটির ঘাড় ভেঙে গেছে। মারা গেছে সে।

'মহিলার ডাকাডাকিতে ওই বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দারা জেগে ওঠে। পুলিশ আর ডাক্তারকে খবর দিয়ে তারা চিলেকোঠায় যায়।

ভেতরে থেকে তালা বন্ধ দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই তীব্র গ্যাসের গন্ধ ধাক্কা মারে তাদের নাকে। যদিও জানালা খোলা ছিল। স্বামী আর স্ত্রীকে বিছানায় মৃত পড়ে থাকতে দেখে তারা।' স্বামী একটি চিরকুট লিখে রেখে গিয়েছিল:

আমি আর পারলাম না। ওদেরকে খুন করতে যাচ্ছি আমি। এ ছাড়া কোন রাস্তা নেই।

'পুলিশ বলেছিল পুরুষ লোকটা পরিবারের সবাই যখন ঘুমাচ্ছিল ওই সময় দরজা-জানালা বন্ধ করে গ্যাস চালিয়ে দেয়। তারপর শুয়ে পড়ে স্ত্রীর পাশে এবং অজ্ঞান হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ছেলেটি যে ভাবে হোক জেগে গিয়েছিল। দরজা খোলার চেষ্টাও বোধহয় করেছিল। দুর্বল শরীরে পারেনি। শেষে জানালা খুলে নীচে লাফিয়ে পড়ে আদরের বোনকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

'ক্রিস্টিন কেন গ্যাসে আক্রান্ত হয়নি এটা একটা রহস্য। হয়তো বেডক্লথ দিয়ে মাথা ঢাকা ছিল তার। ভাইয়ের বুকের সাথে মাথা চেপে ঘুমিয়েছে–ভাইয়ের সঙ্গেই ঘুমাত সে। যাহোক, বাচ্চাটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে হোমে। ওখানে আপনি আর জেমস ওকে প্রথম দেখেছেন...নিঃসন্দেহে ওটা সৌভাগ্যের দিন ছিল ক্রিস্টিনের জন্যে।'

'ওর ভাই তা হলে বোনকে বাঁচাতে গিয়ে মারা গেছে?' বললাম আমি।

'হ্যাঁ। খুব সাহস ছিল ছেলেটির।'

'কী নাম ছিল ভাইয়ের?'

'দেখছি,' ফাইলের স্তূপ থেকে একটা ফাইল বের করলেন মিস ক্লেভার। চোখ বুলাতে লাগলেন। অবশেষে বললেন, 'পরিবারটির নাম জোন্স পরিবার। আর চোদ্দ বছরের ছেলেটির নাম ছিল হ্যারল্ড।'

'তার মাথায় লাল চুল ছিল?' বিড়বিড় করলাম আমি।

'তা বলতে পারব না, মিসেস জেমস।'

'কিন্তু ওটা হ্যারি। ছেলেটার ডাক নাম হ্যারি। কিন্তু এর অর্থ কী? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'অর্থ আমিও বুঝতে পারছি না। তবে আমার ধারণা ক্রিস্টিনের মনের গভীর অবচেতনে হ্যারির স্মৃতি রয়ে গেছে। তার শৈশবের সাথী। আমরা ভাবি শিশুদের স্মৃতিশক্তি তেমন প্রখর নয়, কিন্তু অতীতের অনেক কথাই তাদের ছোট্ট মস্তিষ্কে গেঁথে থাকে। ক্রিস্টিন এই হ্যারিকে আবিষ্কার করেনি, এর স্মৃতি তার মনে পড়ে যাচ্ছে। তাই তাকে সে একটা জ্যান্ত রূপ দিয়েছে। আমার কথা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই এমন অদ্ভুত যে অন্য কোন ব্যাখ্যা মাথায় আসছে না।'

'ওরা যে বাড়িতে থাকত সেটার ঠিকানা পেতে পারি?'

মিস ক্লেভার ঠিকানা দিতে রাজি নন। কিন্তু আমার পীড়াপীড়িতে শেষে দিতেই হলো। আমি ১৩, ক্যানভার রো-র ঠিকানা খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে বাড়িটি খুঁজে পেলাম। বাড়িটি জনমানবশূন্য মনে হলো। নোংরা এবং ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁচেছে। তবে একটা দৃশ্য দেখে থমকে গেলাম। ছোট একটা বাগান আছে বাড়ির সামনে। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সবুজ ঘাস। তবে ছোট্ট বাগানের এক জায়গার অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য গ্রাস করতে পারেনি বিষণ্ন রাস্তার পাশের বাড়িগুলো–সাদা গোলাপের একটা ঝাড়। ঝলমল করছে গোলাপগুলো। চমৎকার সুগন্ধ ছড়াচ্ছে।

ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে চিলেকোঠার জানালার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি।

একটা কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলাম, 'এখানে কী করছেন?'

নীচতলার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছে এক বুড়ি।

'আমি ভেবেছি বাড়িটি খালি,' বললাম আমি।

'খালি থাকাই উচিত ছিল। এখানে আমি ছাড়া কেউ থাকেও না। আমাকে ওরা বের করে দিতে পারেনি। আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই। ঘটনাটা ঘটার পরে অন্য বাসিন্দারা তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। তারপর আর কেউ এ বাড়ি ভাড়া নিতে আসেনি। লোকে বলে এটা নাকি হানাবাড়ি। হয়তো তাই। কিন্তু এ নিয়ে এত হৈ চৈ কেন? জীবন এবং মৃত্যু। একটি অপরটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?'

লাল টকটকে চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল সে। 'আমি ওকে আমার জানালার পাশ দিয়ে ছিটকে পড়ে যেতে দেখেছি। ওই যে ওখানটাতে পড়ে ছিল। ফুলের ঝাড়টার মধ্যে। ও এখনও ফিরে আসে। আমি ওকে দেখতে পাই। তাকে না পাওয়া পর্যন্ত সে যাবেও না।'

'কে–কার কথা বলছেন আপনি?'

'হ্যারি জোন্স। চমৎকার ছেলে ছিল একটা। লাল চুল। ভয়ানক রোগা। খুব জেদী স্বভাব। নিজের মত করে চলত। ক্রিস্টিনকে খুব ভালবাসত। ফুলের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটেছে। গোলাপ ঝাড়ের পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত বোনকে নিয়ে। তারপর মরেছে ওখানটাতেই। নাকি মানুষ সত্যি মারা যায়? চার্চ হয়তো এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। কিন্তু সে জবাব হয়তো আপনার বিশ্বাস হবে না। আপনি চলে যান। এ জায়গা আপনার জন্যে নয়। এ জায়গা মৃতদের জন্যে যদিও তারা মরেনি, আর জীবিতদের জন্যে যারা নাকি জীবিত নয়। আমি জীবিত নাকি মৃত? আপনিই বলুন। আমি জানি না।'

সাদা, কোঁচকানো আঙুলের ফাঁক দিয়ে উন্মাদিনীর দৃষ্টিতে এমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, শিরশির করে উঠল গা। পাগল মানুষ ভয়ঙ্কর প্রকৃতির হয়। কেউ এদের করুণা করে, কেউ ভয় পায়। আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'আমি এখন যাব। বিদায়।'

উত্তপ্ত ফুটপাত দিয়ে দ্রুত পা চালালাম। কিন্তু পা জোড়া ভয়ানক ভারি আর অসাড় মনে হলো, যেন দুঃস্বপ্নের মাঝ দিয়ে হাঁটছি। সূর্য উত্তাপ ছড়াচ্ছে মাথার উপরে। কিন্তু টের পাচ্ছি না যেন। সময় এবং স্থান জ্ঞান হারিয়ে ছুটছি আমি।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে যেতে রক্ত হিম হয়ে এল আমার। তিনটা বাজে। তিনটার সময় আমার স্কুল-গেটে থাকার কথা, ক্রিস্টিনের জন্য। আমি এখন কোথায়? এখান থেকে স্কুল কত দূরে? কোন্ বাস ধরতে হবে? পথচারীদেরকে পাগলের মত এ সব প্রশ্ন করতে লাগলাম। তারা আমার দিকে ভীত চোখে দেখছে, যেন ওই বুড়ির মত চেহারা আমার। ওরা নিশ্চয় আমাকে পাগল ঠাউরেছে। অবশেষে সঠিক বাসে উঠতে পারলাম। ধুলো আর পেট্রলের গন্ধে অস্থির, বুকে প্রচণ্ড ভয় নিয়ে স্কুলে পৌঁছে গেলাম। এক দৌড়ে পার হলাম খেলার মাঠ। ক্লাসরুমে সাদা ড্রেস পরা তরুণী শিক্ষয়িত্রী বইপত্র গোছাচ্ছে।

'ক্রিস্টিন জেমসকে নিতে এসেছি। আমি ওর মা। দুঃখিত, দেরি হয়ে গেছে। কোথায় ও?'

'ক্রিস্টিন জেমস?' ভ্রূ কোঁচকাল তরুণী, তারপর কলকল করে বলল, 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লাল চুলের ছোট্ট, সুন্দর মেয়েটি। ওর ভাই এসেছিল ওকে নিতে, মিসেস জেমস। দুজনের চেহারায় অদ্ভুত মিল আছে, না? আর বোনকে সে যে খুব ভালবাসে তা তার আচরণ দেখেই বুঝতে পেরেছি। আপনার স্বামীরও কি ওদের মত লাল চুল?'

'ওর ভাই–কী বলল?' অস্পষ্ট গলায় জানতে চাইলাম।

'কিছুই বলেনি। প্রশ্ন করলেও শুধু হেসেছে। এতক্ষণে ওরা বোধহয় বাড়ি পৌঁছে গেছে। আপনি ঠিক আছেন তো?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ। আমি গেলাম।'

পা পুড়ে যাওয়া উত্তপ্ত রাস্তার পুরোটাই দৌড়ে বাড়ি চলে এলাম আমি।

'ক্রিস! ক্রিস্টিন, কোথায় তুমি? ক্রিস! ক্রিস!' মাঝে মাঝে এখনও শুনতে পাই আমার সেই আর্তনাদ ঠাণ্ডা বাড়িটির দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে বাড়ি ফিরছে। 'ক্রিস্টিন! ক্রিস! কোথায় তুমি? জবাব দাও! ক্রিইইইইস!' তারপর, 'হ্যারি! ওকে নিয়ে যেয়ো না! ফিরে এসো! হ্যারি! হ্যারি!'

উন্মত্তের মত বাগানে ছুটলাম আমি। প্রখর রোদ ধারাল ফলার মত আঘাত হানল। ধবধবে সাদা গোলাপগুলো ভীষণভাবে জ্বলজ্বল করছে। স্থির বাতাস। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমি বুঝি ক্রিস্টিনের খুব কাছে চলে এসেছি। যদিও ওকে দেখতে পেলাম না। তারপর আমার চোখের সামনে নাচতে শুরু করল গোলাপগুলো, রঙ বদলে হয়ে উঠল লাল। রক্ত লাল। বৃষ্টিস্নাত লাল। মনে হলো আমি লালের মাঝ দিয়ে কালোর মাঝে ঢুকে পড়েছি, তারপর শুধুই শূন্যতা–প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি।

সান স্ট্রোক থেকে ব্রেন ফিভারে আক্রান্ত হয়ে কয়েক হপ্তা বিছানায় পড়ে থাকতে হলো আমাকে। ওই সময় জিম আর পুলিশ মিলে বেহুদাই খুঁজেছে ক্রিস্টিনকে। ব্যর্থ এ প্রচেষ্টা চলল মাস কয়েক ধরে। লাল চুলের মেয়েটির অদৃশ্য হয়ে যাবার ঘটনা নিয়ে খবরের কাগজে নানা গল্প ছাপা হলো। তারপর একসময় থিতু হয়ে এল উত্তেজনা। পুলিশ ফাইলে আরেকটি অমীমাংসিত রহস্য জমা হলো।

শুধু দু'জন মানুষের জানা থাকল আসল ঘটনা। পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে বাস করা একটা পাগলিনী, আর আমি। বছর পার হয়ে গেল। কিন্তু আজও ভয়টা গেঁথে আছে আমার মনে।

ছোট্ট ছোট্ট জিনিস আমাকে ভীত করে তোলে। রোদ। ঘাসের উপরে গাঢ় ছায়া। সাদা গোলাপ। লাল চুলের শিশু। আর একটা নাম–হ্যারি। কত সাধারণ একটা নাম!

মূল গল্পঃ রোজমেরী টিম্পারলির 'হ্যারি।'

ডাইনি

ইরমাকে ডাইনির মত লাগে না।

ও আকারে ছোটখাট, ক্রীমের মত গায়ের রঙ, নীল চোখ–আর ছাই-সোনালি চুলের একটি মেয়ে। বয়স মাত্র আট।

'উনি বাচ্চাটাকে নিয়ে অমন তামাশা করেন কেন?' ফোঁপাচ্ছে মিস পল। 'একই কথা শুনতে শুনতে ওরও মনে সে ধারণাই জন্মেছে–কারণ উনি ওকে খুদে ডাইনি বলে গালাগাল দেন।'

স্যুইভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল স্যাম স্টিভার, কোলের উপরে রাখল মাংসল হাতজোড়া। আইনজীবীর থলথলে চেহারায় কোন ভাব ফুটে না থাকলেও ভিতরে ভিতরে সে রীতিমত উদ্বিগ্ন। মিস পলের মত মহিলাদের কান্নাকাটি করতে নেই। কাঁদলে তাদের চোখের চশমা ঝাঁকি খেতে থাকে, নাকের পেশীতে চলে সঙ্কোচন, ভাঁজঅলা চোখের পাতা হয়ে ওঠে লালচে এবং আঁটো খোপা খুলে গিয়ে অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে চুল।

'প্লীজ, শান্ত হোন,' মিষ্টি গলায় বলল স্যাম স্টিভার। 'আমরা যদি গোটা ব্যাপারটা একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখি–'

'আই ডোন্ট কেয়ার!' নাক টানল মিস পল। 'আমি ওদিকে আর পা মাড়াচ্ছি না। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমার কিছু করারও নেই। লোকটা আপনার ভাই। আর মেয়েটি আপনার ভাতিঝি। যা ঘটছে তার জন্যে আমি দায়ী নই। আমি চেষ্টা করেছি–'

'অবশ্যই আপনি চেষ্টা করেছেন,' তোষামদের ভঙ্গিতে হাসল স্যাম স্টিভার। 'আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনার এত

উত্তেজিত হবার কারণ বুঝতে পারছি না।'

মিস পল চশমা খুলে ফুল আঁকা রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। তারপর ওটা বলের মত পেঁচিয়ে রেখে দিল পার্সে, চশমাটা ফিরে গেল আগের জায়গায়, শিরদাঁড়া টানটান করল সে।

'বেশ, মি. স্টিভার,' বলল সে। 'আমি কেন আপনার ভাইয়ের চাকরি করব না তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছি।' সশব্দে আরেকবার নাক টেনে নিল মিস পল।

'আপনি জানেন বছর দুই আগে খবরের কাগজে হাউজকীপারের বিজ্ঞাপন দেখে আপনার ভাই, জন স্টিভারের কাছে গিয়েছিলাম। মা হারা এক ছ'বছরের বাচ্চার দেখাশোনা করতে হবে শুনে প্রথমে হতাশই বোধ করেছিলাম। কারণ শিশু যত্নের কিছুই জানি না আমি।'

'জন মাস ছয়েকের জন্যে একজন নার্স রেখেছিল,' বলল স্যাম স্টিভার। 'আর আপনার অজানা নয় ইরমার মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়।'

'জানি,' গম্ভীর মুখে বলল মিস পল। 'তবে একা, নিঃসঙ্গ ছোট বাচ্চা দেখলে সবারই মায়া লাগে। আর ইরমা এত একা ছিল, মি. স্টিভার–আপনি যদি ওকে দেখতেন, অমন প্রকাণ্ড, পুরানো আর নোংরা বাড়িটার কোনায় অসহায়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল মেয়েটা–'

'দেখেছি আমি,' দ্রুত বলে উঠল স্যাম স্টিভার। 'আর আপনি ইরমার জন্যে কী করেছেন তাও জানি। আমার ভাইটার মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কম, আর মাঝে মাঝে খানিকটা স্বার্থপরও হয়ে ওঠে। ও আপনার মর্যাদা বুঝতে পারবে না।'

'উনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির,' তীব্র বিবমিষা মিস পলের কণ্ঠে। 'নিষ্ঠুর এবং ধূর্ত! উনি আপনার ভাই হলেও বলছি বাপ হবার যোগ্যতা তাঁর নেই। আমি প্রথম যখন ওখানে যাই বাচ্চাটির হাতে দেখেছি মারের চোটে কালশিটে পড়ে গেছে। উনি বেল্ট

দিয়ে মারতেন–'

'জানি আমি। জন আসলে ওর বউয়ের মৃত্যু শোক এখনও সামলে উঠতে পারেনি। তাই আপনার আগমনে আমি খুশিই হয়েছিলাম। ভেবেছি আপনি পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারবেন।'

'চেষ্টার ক্রুটি করিনি,' গুঙিয়ে উঠল মিস পল। 'আপনি তা ভালই জানেন। গত দু'বছরে একবারের জন্যেও মেয়েটার গায়ে হাত তুলিনি। যদিও আপনার ভাই বহুবার আমাকে বলেছেন, "খুদে ডাইনিটাকে দু'ঘা লাগিয়ে দিন। ধরে মার লাগালেই ও সোজা হয়ে যাবে।" আর এ কথা শুনে ইরমা ভয়ে আমার পেছনে লুকিয়ে পড়ত, ফিসফিস করে বলত আমাকে রক্ষা করতে। কিন্তু কখনও কাঁদত না। আমি ওকে কোনদিন চোখ দিয়ে জল ঝরাতে দেখিনি, মি. স্টিভার।'

স্যাম স্টিভার খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছে, সেই সাথে বিরক্তও। তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আপনার সমস্যাটা কী, ডিয়ার লেডি?'

'আমি ওই বাড়িতে যাবার পরে সব ঠিকঠাক চলছিল। ইরমার সাথে চটজলদি ভাব হয়ে যায় আমার। আমি ওকে পড়তে শেখাতে গিয়ে অবাক হয়ে লক্ষ করি আগেই পড়তে শিখে গেছে সে। আপনার ভাই ওর পড়াশোনার ব্যাপারে বিরূপ ধারণা পোষণ করলেও মেয়েটাকে প্রায়ই দেখতাম সোফায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে বই পড়ছে। অবিকল তার মত,' বলতেন তিনি। 'অদ্ভুত খুদে একটা ডাইনি। বাচ্চাদের সঙ্গে কখনও খেলতে যাবে না। সারাক্ষণ আছে বই নিয়ে। ডাইনি কোথাকার!' এভাবে মেয়েকে সম্বোধন করতেন আপনার ভাই, মি. স্টিভার। বারবার ডাইনি বলতেন। অথচ ওর মত মিষ্টি, শান্ত আর সুন্দর বাচ্চা খুব বেশি দেখিনি আমি।

'ওর বই পড়ার অভ্যাস আমাকে অবাক করলেও বেশি আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম একদিন "এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায়"

মনোনিবেশ করতে দেখে।'

'তুমি কী পড়ছ ইরমা?' জিজ্ঞেস করেছিলাম।

কী পড়ছে দেখাল আমাকে। ডাকিনী চর্চার উপরে একটি প্রবন্ধ।

'ওই ছোট্ট মাথাটার মধ্যে আপনার ভাই কী ভয়ানক চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বুঝতে পারছেন তো?'

'আমি যথাসাধ্য করেছি। ওকে খেলনা কিনে দিয়েছি–ওর কোন খেলনাই ছিল না। এমনকী একটা পুতুলও নয়। ও জানতই না কীভাবে খেলতে হয়! প্রতিবেশীর বাচ্চারা কীভাবে খেলে তা দেখিয়ে ওর মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম। ব্যর্থ হয়েছি। ওরা ইরমাকে বুঝতে পারত না আর ইরমা ওদেরকে। বাচ্চারা এমনিতেই হিংস্র প্রকৃতির আর হৃদয়হীন স্বভাবের হয়। আর ইরমার বাবা ওকে স্কুলেও ভর্তি করেননি। মেয়েটাকে বাসায় বসে পড়াতাম আমি–

'একদিন ওর জন্যে মূর্তি বানানোর মাটি নিয়ে এসেছি। ওর খুব পছন্দ হলো জিনিসটা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে থাকে সে মাটি দিয়ে পুতুলের মুখ বানিয়ে। ছয় বছর বয়স হলে কী হবে, দারুণ সব মূর্তি বানাতে পারত ইরমা।

'আমরা এক সাথে মূর্তি বানাতাম। পুতুলের জন্যে আমি কাপড় সেলাই করে দিতাম। প্রথম বছরটা বেশ ভালই কাটল। বিশেষ করে ওই ক'টা মাস, যেবার আপনার ভাই ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকায়। কিন্তু এ বছরটা, যখন আপনার ভাই ফিরে এলেন–ওহ্, আমি আর বলতে পারব না!'

'প্লীজ,' বলল স্যাম স্টিভার। 'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। জন অসুখী একজন মানুষ। স্ত্রীকে হারানোর ব্যথা, তার আমদানী ব্যবসায়ে ধস, মদ পানের অভ্যাস–সবই তো জানেন আপনি।'

'আমি শুধু জানি উনি ইরমাকে ঘৃণা করেন,' হঠাৎ চেঁচিয়ে

উঠল মিস পল। 'উনি তাঁর সন্তানের মঙ্গল চান না। তাই যখন তখন বেত মারেন। 'আপনি খুদে ডাইনিটাকে ডিসিপ্লিন শেখাতে না পারলে আমি শেখাব,' সারাক্ষণ এ কথা জপতে থাকেন তিনি। তারপর ইরমাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে বেল্ট খুলে ইচ্ছে মত চাবকাতে থাকেন। আপনার কিছু করা উচিত, মি. স্টিভার। নইলে আমি নিজে পুলিশের কাছে যাব।'

পাগলী বুড়িটা ঠিকই তা করবে, ভাবল স্যাম স্টিভার।

'ইরমার কথা শেষ করুন,' বলল সে।

'ইরমাও অনেকটা বদলে গেছে। বিশেষ করে তার বাপ এ বছর বিদেশ থেকে ফেরার পরে। সে আর আমার সঙ্গে খেলা করে না। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। তার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে সে একটা ডাইনি।'

পাগলী। বুড়িটা সত্যি একটা পাগল। স্যাম স্টিভার কটমট করে তাকাল মিস পলের দিকে।

'আমার দিকে ওভাবে চাইবেন না, মি. স্টিভার। আপনি ও বাড়িতে একবার যান। নিজের কানেই শুনতে পাবেন কথাটা। ইরমা আমাকে বলেছে তার বাপ যদি চায় মেয়ে ডাইনি হবে তা হলে তাই হবে সে। সে আর আমার সঙ্গে কিংবা অন্য কারও সাথে খেলা করবে না। ডাইনিরা নাকি খেলে না। গত হ্যালোউইনে ও আমার কাছে একটা ঝাড়ু চেয়েছিল। বাচ্চাটার মাথা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

'হপ্তাখানেক আগে আমার মনে হলো মেয়েটা সত্যি বদলে গেছে। সে রোববার আমাকে চার্চে নিয়ে যেতে বলল। ব্যাপ্টিজম দেখবে। চিন্তা করুন–আট বছরের একটি বাচ্চা ব্যাপ্টিজমের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে! খুব বেশি বই পড়ে মাথাটাই গেছে। 'যাক, আমরা চার্চে গেলাম। নতুন নীল রঙের পোশাকটা পরে ছিল ইরমা, আমার হাত মুঠো করে ধরা। খুব ভাল লাগছিল তখন।

'কিন্তু চার্চ থেকে ফিরে ও ঢুকে পড়ল নিজের গর্তে। বই হাতে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে পড়ে, সাঁঝ বেলায় উঠোনে দৌড়াদৌড়ি করে আর আপন মনে বকবক করতে থাকে।

'একদিন ইরমা তার বাপের কাছে একটা কালো বেড়াল এনে দেয়ার আবদার করে বসল। কেন, জানতে চাইলেন বাপ।

'কারণ ডাইনিদের সবসময় কালো বেড়াল থাকে,' ইরমার জবাব। তারপর তিনি ওকে নিয়ে দোতলায় চলে গেলেন।

'আপনার ভাইকে থামানোর শক্তি আমার নেই। তিনি ইরমাকে আবার ধোলাই দিলেন। সে রাতে বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল। মোমবাতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। উনি বললেন ইরমা ওগুলো চুরি করেছে। ভাবুন একবার–আট বছরের একটা বাচ্চাকে মোমবাতি চুরির অপবাদ দিলেন!

'তারপর আজকে দেখলেন তাঁর হেয়ার ব্রাশ অদৃশ্য–'

'জন ইরমাকে হেয়ার ব্রাশ দিয়ে মেরেছে?'

'হ্যাঁ। ইরমা স্বীকার গেছে সে হেয়ার ব্রাশ চুরি করেছিল পুতুলের জন্যে নাকি ওটা দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'আপনিই না বললেন ওর কোন পুতুল নেই?'

'ও বানিয়ে নিয়েছে একটা। যদিও চেহারা দেখিনি পুতুলটার–সে তার কোন কিছুই আমাদেরকে দেখতে দিত না: খাবার টেবিলে বসে কথা বলত না। ও ক্রমে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

'তবে ইরমার পুতুলটা আকারে ছোট। একদিন বগলের নীচে চেপে আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখেছি। পুতুলের সঙ্গে সে কথা বলে, তাকে আদর করে। কিন্তু আমাদেরকে কখনও দেখতে দেয় না। ওর বাপ যখন শুনলেন ইরমা তাঁর হেয়ার ব্রাশ চুরি করেছে পুতুলের জন্যে, রাগে উন্মাদ হয়ে গেলেন। সকাল থেকে ঘরে বসে মদ খাচ্ছিলেন তিনি। ইরমা বাপকে একটুও ভয় না পেয়ে হাসিমুখে ব্রাশটা নিয়ে এল। ব্রাশের কোন ক্ষতি করেনি

সে। লক্ষ করলাম ব্রাশে তখনও ওর বাবার মাথার কয়েক গাছি চুল লেগে রয়েছে।

'হেয়ার ব্রাশটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তিনি ওটা দিয়ে ইরমার কাঁধে বাড়ি মারতে লাগলেন, হাত মুচড়ে দিলেন, তারপর–' মিস পল এলিয়ে পড়ল চেয়ারে, রীতিমত হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগল।

স্যাম স্টিভার তার কাঁধ চাপড়ে দিল।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মিস পল বলল, 'এরপরে আমার আর ও বাসায় থাকা সম্ভব হয়নি। বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে চলে এসেছি এখানে। আমি আর সহ্য করতে পারিনি–যেভাবে বাচ্চাটাকে মারছিলেন উনি–কিন্তু মেয়েটা এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেনি, শুধু খিলখিল করে হাসছিল আর হেসেই যাচ্ছিল–ওর আচরণ দেখে মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে ও বুঝি সত্যি একটা ডাইনি–আপনার ভাই-ই তাকে ডাইনি বানিয়েছে–'

স্যাম স্টিভার ফোন তুলল। মিস পল ঝড় তুলে চলে যাবার পরে স্বস্তিকর নীরবতাটা ভেঙে দিয়েছে রিং-এর আওয়াজ। 'কে–ভাইয়া?'

ছোট ভাইয়ের কণ্ঠস্বর। বোঝাই যায় মদে চুর।

'হ্যাঁ, জন।'

'ওই বুড়ি নিশ্চয়ই তোমার ওখানে গেছে মুখের চুলকানি কমাতে।'

'মিস পলের কথা বলছিস? হ্যাঁ, এসেছিল সে এখানে।'

'ওর কথা একদম বিশ্বাস করবে না। আমি তোমাকে সব ব্যাখ্যা করব।'

'তোর ওখানে আসব একবার? অনেকদিন দেখা নেই।'

'এসো–তবে আজ নয়। ডাক্তারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সন্ধ্যাবেলায়।'

'কোন সমস্যা?'

'হাতে ব্যথা। বাত জ্বর বা ওরকম কিছু একটা হবে হয়তো। কাল তোমাকে ফোন করব।'

'ঠিক আছে।'

কিন্তু পরদিন ফোন করল না জন স্টিভার। সাপারের সময় তাকে ফোন করল স্যাম।

অবাক হয়ে গেল ইরমা ফোন ধরায়। তার সরু, কিচকিচে গলা অস্পষ্ট শোনাল।

'ড্যাডি দোতলায় ঘুমাচ্ছে। অসুস্থ।'

'ঠিক আছে। ওকে বিরক্ত কোরো না। হাতে ব্যথা, না?'

'এবার পিঠেও ব্যথা করছে। ড্যাডি ডাক্তারের কাছে আজ আবার যাবে।'

'ওকে বোলো কাল আবার ফোন করব। আ-সব ঠিক আছে তো, ইরমা? মানে, মিস পলকে মিস্ করছ না তো?'

'না। ও গেছে ভালই হয়েছে। মহিলা একটা বোকা।'

'আমারও তাই ধারণা। যাকগে, কোন কিছু দরকার হলে ফোন কোরো আমাকে। দোয়া করি তোমার ড্যাডি যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে।'

'আমিও দোয়া করি,' বলল ইরমা, তারপর খিলখিল করে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে রেখে দিল ফোন।

পরদিন বিকেলে জন স্টিভার তার বড় ভাইকে অফিসে ফোন করল। কণ্ঠ গম্ভীর-তাতে যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট।

'ভাইয়া-ফর গডস শেক, জলদি চলে এসো এখানে। আমার কী যেন হয়েছে!'

'অফিসে একজন ক্লায়েন্ট আছে। ওকে বিদায় করেই আসছি। তুই ডাক্তার দেখাসনি?'

'ওই হাতুড়েটা কোন সাহায্য করতে পারবে না। সে আমার হাতের জন্যে যে ওষুধ দিয়েছে, পিঠের ব্যথার জন্যে সেই একই

ওষুধ দিয়েছে গতকালও ।'

'ওষুধে কাজ হয়নি?'

'ব্যথাটা চলে গিয়েছিল। কিন্তু আবার ফিরে এসেছে। মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে আমার হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড চাপ। শ্বাস নিতে পারি না।'

'প্লুরিসি মনে হচ্ছে।'

'এটা প্লুরিসি না। ডাক্তার পরীক্ষা করেছে আমাকে। বলেছে আমার ফুসফুস ঠিকই আছে। শারীরিক দিক থেকে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আমি তাকে আসল কারণটা বলতে পারিনি।'

'আসল কারণ?'

'হ্যাঁ। পিন। খুদে দানবটা তার পুতুলের গায়ে যে পিন ঢোকাচ্ছে, সেগুলো। হাতে পিন ঢোকাচ্ছে, পিঠে। ঈশ্বর জানে ও এসব ঘটাচ্ছে কীভাবে।'

'জন, তুই বলতে চাস—'

'বলে কী লাভ? সে মোমবাতির মোম আর আমার মাথার চুল দিয়ে পুতুল বানিয়েছে। ওহ্—কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে—অভিশপ্ত ডাইনি! জলদি ভাইয়া। কিছু একটা করো—যে কোন ভাবে ওই পুতুলটা ওর হাত থেকে নিয়ে নাও—ওই পুতুল—'

আধঘণ্টা পরে, সাড়ে চারটার সময় স্যাম স্টিভার তার ভাইয়ের বাসায় এল।

ইরমা খুলে দিল দরজা।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাসছে মেয়েটা। গোলাপী, ডিমের মত মুখ, ম্লান সোনালি চুল চমৎকার ভাবে আঁচড়ানো, ছোট্ট একটা পুতুল যেন—

'হ্যালো, স্যাম চাচা।'

'হ্যালো, ইরমা। তোমার ড্যাডি ফোন করেছিল। তোমাকে বলেনি? শুনলাম ওর শরীরটা ভাল নেই—'

'জানি আমি। তবে ড্যাডি এখন ঠিক আছে। ঘুমাচ্ছে।'

শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা বরফ জল নামল স্যাম স্টিভারের।

'ঘুমাচ্ছে?' কর্কশ শোনাল তার কণ্ঠ। 'দোতলায়?'

ইরমা জবাব দেওয়ার আগেই সে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে উঠতে শুরু করল, হলঘর থেকে এক ছুটে ঢুকে পড়ল জনের বেডরুমে।

জন শুয়ে আছে বিছানায়। সত্যি ঘুমাচ্ছে। নিঃশ্বাসের তালে ওঠা নামা করছে বুক। মুখখানা শান্ত, উদ্বেগহীন।

শঙ্কার পাষাণ নেমে গেল বুক থেকে, মুখে হাসি ফোটাতে পারল স্যাম, বিড়বিড় করল, 'ননসেন্স।' দম নিয়ে ঘুরল সে।

সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় করণীয় কর্তব্য ঠিক করে ফেলল স্যাম। ছয় মাসের ছুটিতে পাঠাবে সে ভাইকে। ইরমাকে পাঠিয়ে দেবে কোন এতিমখানায়; এই পুরানো, দমবন্ধ করা বাড়ি থেকে মুক্তির একটা সুযোগ পাক মেয়েটা।

সিঁড়ির মাঝামাঝিতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল স্যাম।

সিঁড়ির হাতলের ফাঁক দিয়ে ইরমাকে দেখছে। সাঁঝের আলোয় সোফায় একটা সাদা ছোট্ট বলের মত লাগল গুটিসুটি মেরে থাকা মেয়েটাকে। ও হাতে কিছু একটা রেখে ওটাকে দোলাচ্ছে আর আপন মনে বকবক করছে।

হাতের জিনিসটা একটা পুতুল, সম্ভবত।

পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল স্যাম। হেঁটে গেল ইরমার দিকে।

'হ্যালো,' বলল সে।

লাফিয়ে উঠল ইরমা। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সে ওটাকে, আড়াল করে ফেলল স্যামের সামনে থেকে। চেপে ধরে থাকল।

স্যাম স্টিভারের মনে হলো একটা পুতুলই বুকের সাথে চেপে ধরেছে ইরমা–

'ড্যাডি এখন ভাল আছে, না?' আধো গলা ইরমার।

'হ্যাঁ, আগের চেয়ে ভাল।'

'আমি জানি ভাল থাকবে।'

'ওর কয়েক দিনের জন্যে বাইরে যাওয়া দরকার। লম্বা রেস্ট।'

ভাবলেশ শূন্য চেহারায় হাসির রেখা ফুটল। 'ভাল।'

'তবে,' বলে চলল স্যাম। 'তোমাকে এখানে একা থাকতে হবে না। তোমাকে স্কুলে পাঠিয়ে দেব কিংবা কোন হোমে–'

খিলখিল হাসল ইরমা। 'আমাকে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না।' সরে গিয়ে স্যামকে সোফায় বসার জায়গা করে দিল। কিন্তু স্যাম একটু কাছে এগিয়ে আসতে স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠল।

ইরমার হাত নড়ে গেল মুহূর্তের জন্য, ওর কনুইয়ের নীচে খুদে একজোড়া পা ঝুলতে দেখল স্যাম এক ঝলক। পায়ে ট্রাউজার্স এবং চামড়ার জুতো।

'তোমার কোলে ওটা কী, ইরমা?' জিজ্ঞেস করল সে। 'পুতুল?' হাত বাড়িয়ে দিল স্যাম।

পিছু হঠল ইরমা।

'আপনাকে দেখাব না।'

'কিন্তু আমি দেখতে চাই। মিস পল বলেছে তুমি নাকি খুব সুন্দর একটি পুতুল বানিয়েছ।'

'মিস পল বোকা। আপনিও। চলে যান।'

'প্লীজ, ইরমা। দেখি না একটু।'

কথা বলছে স্যাম, তবে চোখ পুতুলের মাথার দিকে। এক মুহূর্তের জন্য মাথাটা দেখা গেল ইরমা পিছিয়ে যেতে। মাথাই বটে। সাদা মুখের উপরে কয়েক গাছি চুল। সাঁঝের আলোয় চেহারাটা আবছা দেখালেও ওটার চোখ, নাক এবং চিবুক বড় পরিচিত স্যামের–

আর ধৈর্য ধরতে পারল না স্যাম।

'আমাকে পুতুলটা দাও, ইরমা!' ধমকে উঠল সে। 'আমি জানি ওটা কী। আমি জানি ও কে–'

এক মুহূর্তের জন্য শিশুসুলভ মুখোশটা খসে পড়ল ইরমার মুখ

থেকে। স্যাম স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল নগ্ন ভয়ের দিকে।

ও জানে। ও জানে স্যাম ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে। তারপর, আগের মত দ্রুত ফিরে এল মুখোশ।

মিষ্টি, সুন্দর একটা বাচ্চা, চোখের তারায় ঝিকমিক করছে দুষ্টুমি।

'ওহ্, স্যাম চাচা,' খিলখিল হাসল সে। 'আপনি যা বোকা! এটা সত্যিকারের পুতুল না তো!'

হাসতে হাসতে জিনিসটা তুলে ধরল ও। 'এটা তো মিষ্টি!'

'মিষ্টি?'

মাথা ঝাঁকাল ইরমা। তারপর ঝট্ করে পুতুলের ছোট্ট মাথাটা মুখে পুরে দিল। এবং কামড় বসাল।

সাথে সাথে দোতলা থেকে ভেসে এল মরণ আর্তনাদ।

স্যাম স্টিভার ঘুরে পাগলের মত ছুটল সিঁড়ি লক্ষ্য করে, আর ছোট্ট ইরমা, এখনও কচরমচর চিবাচ্ছে, বেরিয়ে পড়ল সদর দরজা খুলে, হারিয়ে গেল আঁধার রাজ্যে।

মূল গল্পঃ রবার্ট ব্লচের 'সুইটস টু দ্য সুইট'

ভৌতিক ছড়ি

হ্যালস্টিড অ্যান্ড গ্রেনিং কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত অংশীদার মি. জেমস গ্রেনিং অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ একজন মানুষ। রোববার বাদে প্রতিদিন সকালে তিনি তাঁর ব্লুমসবারি'র বাড়ি থেকে নিয়মমাফিক ঘুরতে বের হন। হাই হলবর্ন পেরিয়ে কিংসওয়ে হয়ে সোজা চলে আসেন গ্রেট কুইন স্ট্রীটে এবং ড্রুরি লেন হয়ে ঘরে ফেরেন। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় বাড়ি থেকে বের হন মি. গ্রেনিং, ঠিক এগারোটায় ছোট এক সিগারেটের দোকানে থামেন রোসা ট্রফেরো সিগার কেনার জন্য। তাঁর পদক্ষেপ এমনই নিয়মিত যে যখন তিনি বাড়ির সদর দরজায় নক্ করেন তখন হলঘরের দেয়ালঘড়িটি ঢং ঢং শব্দে জানান দেয় দুপুর বারোটা বেজেছে।

ডাক্তারের নির্দেশে শরীর ঠিক রাখার জন্য মি. গ্রেনিংকে প্রতিদিন এভাবে ঘণ্টা দুই হাঁটাহাঁটি করতে হয়। আর প্রাতঃভ্রমণে বেরুবার সময় হাতে তিনি একখান্া ছড়ি রাখেন। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, বিভিন্ন দিন তিনি বিভিন্ন রঙ এবং আকৃতির ছড়ি ব্যবহার করেন। যেমন, সোমবার তাঁর হাতে থাকবে কালো মালাক্কা! মঙ্গলবার রোজউড কাঠের তৈরি একটি সরু ছড়ি। বুধবারের ছড়িটি ভারি ওক কাঠের তৈরি। বৃহস্পতিবারেরটি কুচকুচে কালো কাঠের। শুক্রবারেরটি মেহগনি কাঠের তৈরি, মাথায় রূপোর হাতল। আর শনিবারের ছড়িটি ওয়ালনাট কাঠের, খুব মসৃণ এবং ভারি সুন্দর।

বৃহস্পতিবার, এক হিমহিম সকালে, কারণ তার আগের রাতে হয়েছে প্রবল বর্ষণ, মি. গ্রেনিং নিয়মমাফিক সকাল দশটায় বাড়ি

থেকে বেরুলেন। দুপুর বারোটায় সিগারেটের দোকানদার খুবই আশ্চর্য হলো তাঁর নিয়মিত খদ্দেরটি তখনও সিগার কিনতে না আসায়। আর বেলা একটার সময়েও মি. গ্রেনিং-এর হাউসকিপার তার মনিবকে বাড়ি পৌঁছুতে না দেখে দারুণ অবাক হয়ে আগড়ুম বাগড়ুম ভাবতে শুরু করল।

মি. গ্রেনিং, যিনি জীবনেও তাঁর দৈনন্দিন রুটিনের একচুল হেরফের করেননি, এই প্রথম তাঁর রুটিন ভাঙলেন। বলা উচিত ভাঙতে বাধ্য হলেন। কারণ এমন আকস্মিক একটি ঘটনা ঘটল যে তিনি সব ভুলে কাঁপতে কাঁপতে ক্ল্যারজিন্স স্ট্রীটে তাঁর পুরানো বন্ধু স্যার হিউগ স্ট্যানওয়ের বিলাসবহুল বাড়ির দরজায় কড়া না নেড়েই ঢুকে পড়লেন। ঢুকেই একটা সোফায় ধপ্ করে বসে দুর্বোধ্য গলায় কী সব বলতে লাগলেন। স্যার হিউগ স্ট্যানওয়ে তাঁর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলেন, 'ওহে গ্রেনিং, ওভাবে বিড়বিড় না করে একটু সুস্থির হয়ে বসো। তারপর ধীরে সুস্থে বলো কী হয়েছে। তোমাকে এমন অস্থির লাগছে কেন?'

কাঁপা হাতে টেবিলের উপর থেকে মদের পাত্রটি নিয়ে গ্লাসে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে ওটা ঢকঢক করে গিলে ফেললেন মি. গ্রেনিং। 'এই ছড়িটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু চোখে পড়ছে তোমার?' ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি, ছড়িটি বাড়িয়ে দিলেন বন্ধুর দিকে।

স্যার হিউগ লম্বা, মসৃণ ছড়িটি হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন। এক হাঁটুর উপর রেখে ওজন পরীক্ষা করলেন, ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেন কোথাও ভেঙেটেঙে গেছে কিনা। তারপর জিনিসটাকে শক্ত মুঠিতে ধরে মাথার উপর সাঁইসাঁই করে ঘোরালেন, যেন শূন্যে তরবারি চালাচ্ছেন।

ছড়িটির মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। ভারি, কাঠের তৈরি সৌখিন একটি জিনিস, মাথায় ছোট সোনার টুপি, বহু ব্যবহারে

কয়েক জায়গায় চলটা উঠে গেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষরাই এ ধরনের ছড়ি বেশি ব্যবহার করে। স্যার হিউগ মি. গ্রেনিংকে ফিরিয়ে দিলেন তাঁর জিনিস। প্রশ্নবোধক চোখ তুলে তাকালেন বন্ধুর দিকে। 'তুমি যে ছটা ছড়ি ব্যবহার করো এটা সেগুলোর কোনটা নয়,' বললেন তিনি। 'এ ছাড়া তো নতুন কিছু চোখে পড়ল না আমার।'

'স্ট্যানওয়ে,' ঢোক গিললেন মি. গ্রেনিং, 'এই ছড়িটা ভৌতিক! ভূত ভর করেছে এটার ওপর, বিশ্বাস করো! আমি যদি এটার হাত থেকে রক্ষা না পাই নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব। ওটাকে অনেক আগেই ভেঙে ফেলতাম যদি...যদি না ওটার ভেতর থেকে একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে বাধা দিত।'

'ভূত?' নীরস গলায় প্রশ্ন করলেন স্যার হিউগ, ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল তাঁর।

'ওটা গতকাল আমার হাতে এসেছে।' বন্ধুর বিদ্রূপাত্মক হাসি দেখেও যেন দেখলেন না মি. গ্রেনিং। 'গত হপ্তায় আমার একটা ছড়ি ভেঙে গিয়েছিল বলে ওই জিনিসটাকে আমি এক নিলাম থেকে আট শিলিং দিয়ে কিনি। নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণে আজই সকালে ওটাকে নিয়ে বেরুই আমি।

'ঘটনাটা ঘটে গ্রেট কুইন স্ট্রীটে, এগারোটার কিছু আগে। ওই রাস্তায় বেশ কিছু পুরানো বাড়িঘর আছে, তুমি জানো। ফ্রীম্যান'স হল রাস্তাটার ঠিক পেছনেই। ওই বাড়ি থেকে একদল লোক বেরুচ্ছিল কাঁধে একটা কফিন নিয়ে। ছ'জন লোক ছিল দলটাতে। কৌতূহলী হয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম রাস্তায়। চোখ আটকে গেল এক কফিন বহনকারীর দিকে। লোকটি কফিনের ডানদিকের ভার বইছিল। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, সুদর্শন। সে ঘুরতেই আমি তার মুখ দেখতে পেলাম। ঠোঁটের দু'কোণ কুঁচকে ছিল তার, যেন হাসছে। মনে হচ্ছিল পুরো ব্যাপারটাতেই সে খুব মজা পাচ্ছে।

'তারপর স্ট্যানওয়ে, কী থেকে কী হয়ে গেল ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু ঘটনাটা জীবনেও ভুলব না আমি। আমার এই ছড়িটা…হাতে ধরা ছড়িটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। হঠাৎ মনে হলো হাতলটা যেন কেঁপে উঠল। অকস্মাৎ একটি ভাইব্রেশনের মত…যেন ধাতব ক্যাপটায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো।

'প্রথমে ভাবলাম জিনিসটা বুঝি ভেঙে গেছে। হঠাৎ প্রবল বেগে একটা ঝাঁকুনি খেলো ওটা। টের পেলাম ছড়িটা আমার হাত তুলে ফেলছে শূন্যে। মাথার ওপর উঠে গেল ওটা, এক মুহূর্ত স্থির থাকল, তারপর চাবুকের মত আগুপিছু করে হিসহিস শব্দ তুলল বাতাসে।

'ছড়ি মাথার ওপর, মনে হলো মাথার মধ্যে কী জানি ঘটে যাচ্ছে আমার। হঠাৎ হালকা হয়ে গেল মাথাটা…যেন অন্য কোন শক্তি আমার সমস্ত চিন্তাচেতনাকে গ্রাস করল। আমি বোধহয় প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠেছিলাম কারণ দেখলাম লোকজন আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে ফিরে চাইল। তারপরই আমি পশুর মত দৌড়ে গেলাম সামনে, সেই সুদর্শন যুবকের কাঁধ চেপে ধরলাম সজোরে, জোর করে আমার দিকে ঘোরালাম তাকে, তারপর–ওহ্, ঈশ্বর!–তারপর সর্বশক্তি দিয়ে ছড়িটা দিয়ে আঘাত করলাম তার খুলিতে।

'আঘাত করার পর মাত্র একবার তাকিয়েছিলাম আমি লোকটার দিকে। কফিন ছেড়ে দিয়েছিল সে, মাথায় হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ওপর, দরদর করে আঙুলের ফাঁক বেয়ে পড়ছিল রক্ত। আমি পরক্ষণে দৌড়ে পালালাম ওখান থেকে।'

মি. গ্রেনিং তাঁর চেয়ারে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিলেন, অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকলেন টেবিলের দিকে। 'তারপর সারা রাস্তা আমি তাড়া খাওয়া খরগোশের মত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটেছি। লোকটাকে আমি খুন করিনি, স্ট্যানওয়ে, আমি তাকে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে যা ঘটেছে তার জন্য আমি দায়ী নই মোটেই। কেন যে কাজটা করলাম তার কোন ব্যাখ্যাই আমি দিতে পারব না। আমার সমস্ত শক্তি অন্য কোন শক্তি যেন নিয়ন্ত্রণ করছিল, আর অদ্ভুত শোনালেও সত্যি, সেই শক্তি আসছিল এই ছড়িটা থেকে!'

স্যার হিউগ জানতে চাইলেন, 'তুমি যে লোকটিকে আঘাত করেছ তাকে আগে কখনও দেখোনি, এ ব্যাপারে কী তুমি নিশ্চিত?'

প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকালেন মি. গ্রেনিং। 'জীবনেও তাকে দেখিনি।'

'আর তোমার শরীর স্বাস্থ্য ঠিক আছে তো?'

'শরীর স্বাস্থ্য?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মি. গ্রেনিং। 'ড্যাম, স্ট্যানওয়ে, তুমি আসলে কী বলতে চাইছ−'

'আমি তোমার কাছ থেকে কয়েকটি কথা জানতে চাইছি,' বাধা দিলেন স্যার হিউগ। 'তুমি বলছ এই ছড়িটি একটা নিলাম থেকে কিনেছ?'

'হ্যাঁ, কার্টারের নিলামঘর থেকে। গতকাল। আট শিলিং দিয়ে কিনেছি।'

'এর আগের মালিক কে ছিলেন জানো কিছু?'

'না। দাঁড়াও, দাঁড়াও। মনে পড়েছে। এই ছড়ির আগের মালিক ছিলেন ওয়েলস নামে এক লোক। স্টিফেন ওয়েলস। "টাইমস" পত্রিকা তাঁর মৃত্যুর খবর ছেপেছিল। এই তো, এ ছাড়া আমি তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

মাথা দোলালেন স্যার হিউগ। 'আরেকটা জিনিস,' বললেন তিনি। 'নিলামের সময় কোন অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে তোমার?'

মি. গ্রেনিং কী যেন মনে করার চেষ্টা করলেন প্রাণপণে। হঠাৎ তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, দুই ভ্রূতে ফুটে উঠল বিস্ময়ের

চিহ্ন। 'আচ্ছা, আচ্ছা এখন মনে পড়ছে ব্যাপারটা,' বললেন তিনি। 'নিলামে আমার ডাকটাই সবচেয়ে বড় ছিল না। ডাক শুরু হয় তিন শিলিং থেকে। ছয়ে ওঠার পর আমি আট শিলিং ডাকি। কিন্তু আমি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার পেছনের লোকটি দশ শিলিং ডেকে বসে। কিন্তু নিলামদার আট শিলিঙেই ছড়িটা আমাকে দিয়ে দেয়। আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ নিলামদার সর্বোচ্চ ডাকের কথা নিশ্চয়ই শুনেছিল। তারপরও আমাকে কেন সে ওটা দিল, কে জানে। তবে আরও অবাক ব্যাপার, আমার পেছনের লোকটি এই ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ না করেই চলে যায়।'

শুনতে শুনতে স্যার হিউগ ক্রমশ আকর্ষণ বোধ করতে লাগলেন গোটা ব্যাপারটায়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, দাঁড়ালেন জানালার কাছে, প্রায় জনশূন্য রাস্তার দিকে এক ঠায় তাকিয়ে থাকলেন। অন্যমনস্কভাবে পকেট থেকে পাইপ বের করলেন তিনি, দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরলেন ওটাকে। 'গ্রেনিং,' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি বন্ধুর দিকে, 'তুমি ছাড়া অন্য কেউ যদি আমাকে গল্পটা বলত, আমি তাকে নির্ঘাত পাগল ঠাওরাতাম। কিন্তু তোমাকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। জানি ফালতু কথা বলার লোক তুমি নও। আমি কি এই ব্যাপারটার মধ্যে নাক গলাতে পারি?'

মি. গ্রেনিং বিস্মিত গলায় বললেন, 'কেন নয়? অবশ্যই। আমি তো সেজন্যেই তোমার কাছে এসেছি। কিন্তু কীভাবে—'

'কিছু একটা ভজকট আছে এর মধ্যে। আমি একটু বেরুব এখন। দেখি রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোন ক্লু পাই কিনা। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো, গ্রেনিং। রাস্তায় এ সময় না বেরুনোই ভাল। হলঘরের ডানদিকের প্রথম ঘরটা তোমার জন্য গোছগাছ করে দেবে আমার লোক। ওখানেই বিশ্রাম নাও।'

'কিন্তু এ ব্যাপারে কি কিছুই বলার নেই তোমার?' বললেন

মি. গ্রেনিং। 'কোন আইডিয়া কাজ করছে না মাথায়?'

'এখনও নয়,' জবাব দিলেন স্যার হিউগ, হাত বাড়ালেন হাতমোজা আর হ্যাটের দিকে। তাঁর চোখে ঝিলিক দিল উত্তেজনা। 'কোন মন্তব্য করার আগে একটু ঘুরে ফিরে দেখে আসি। তবে তোমার জ্ঞাতার্থে আপাতত এটুকু বলা যায়, তুমি যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দৃশ্য দেখেছ, ওই কফিনে ছিল স্টিফেন ওয়েলসের লাশ, তোমার এই ছড়ির প্রাক্তন মালিক।'

মি. গ্রেনিং-এর বিকেল কাটল অসহ্য ধীরগতিতে। বইয়ের পাতায় জোর করে তিনি বারবার মনোনিবেশের চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রতিবারই ছাপার অক্ষরগুলো চোখের সামনে অস্পষ্ট হয়ে উঠল, ভেসে উঠল দুপুরবেলা ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর ঘটনার দৃশ্যাবলী। সন্ধ্যা এল। কিন্তু স্যার হিউগ তখনও ফিরলেন না। মি. গ্রেনিংকে রাতের খাবার পরিবেশন করল স্যার হিউগের কাজের লোক। কিন্তু খাবারগুলো গলা দিয়ে নামতে চাইল না তাঁর। ডিনারের পর তিনি অনেকক্ষণ লাইব্রেরি ঘরে পায়চারি করলেন, শেষে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। কড়িকাঠের দিকে বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর একসময় ঘুম নেমে এল তাঁর চোখে।

ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখলেন মি. গ্রেনিং। লন্ডনের রাস্তায় ছড়ি হাতে ছুটছেন তিনি, প্রতিটি পথচারীর খুলি ফাটিয়ে চলছেন একের পর এক। রক্তাক্ত লাশ পেছনে ফেলে সামনে এগোতে থাকলেন তিনি। রাত দুটোয় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। সারা শরীর কাঁপছে থর থর করে।

ঘরটি প্রচণ্ড গরম। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। এক ফোঁটা বাতাসও নেই। সমস্ত প্রকৃতি যেন সীমাহীন নীরবতার উল্লাসে চিৎকার করছে। মি. গ্রেনিং ঘুম ঘুম মস্তিষ্কে পুরো ব্যাপারটিকে নিয়ে আবার ভাবার চেষ্টা করলেন। লোকটিকে তিনি খুন করেননি, শুধু মাথায় একটা বাড়ি মেরেছেন। যারা দৃশ্যটি

দেখেছে তারা হয়তো কালকের মধ্যে ঘটনাটি ভুলেও যাবে। আর লন্ডনে এরকম মাথা ফাটাফাটির ঘটনা তো আকছার ঘটছে।

মি. গ্রেনিং বসে থাকতে থাকতে টের পেলেন তাঁর মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে অন্য একটি শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে। তাঁর ভিতর থেকে তীব্র একটা ইচ্ছে জাগছে পোশাক পরে বাইরে যেতে, ঘুরে বেড়াতে মন চাইছে প্রাতঃভ্রমণের সেই রাস্তাগুলোতে। তাঁর মনে হলো তাঁর সমস্ত শরীর যেন লোহার তৈরি, আর বাইরে থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী কোন চুম্বক তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করছে।

শেষ পর্যন্ত ইচ্ছেটা এমন তীব্র হয়ে উঠল, মি. গ্রেনিং যেন নিজের অজ্ঞাতেই বিছানা ছেড়ে নামলেন, ঘরের আলো জ্বাললেন, পোশাক পরতে শুরু করলেন। পোশাক পরে এগোলেন তিনি দরজার দিকে, কবাটে হাত রেখেছেন, এই সময় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন পেছন দিকে।

ছড়ি! তাঁর ছড়িটি চেয়ারের গায়ে এখনও হেলান দিয়ে রাখা। ঘুরলেন মি. গ্রেনিং, হেঁটে এলেন ঘরের মাঝখানে, দাঁড়ালেন ছড়িটি থেকে কয়েক হাত দূরে। তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ভারি, লম্বা কাঠটির দিকে। আপনাআপনি তাঁর হাতের মুঠো দৃঢ় হলো, ওটাকে অগ্রাহ্য করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু এক মুহূর্ত পর তিনি যখন সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন, হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন রাস্তা দিয়ে, কেউ লক্ষ করলে দেখতে পেত ছড়িটি তিনি শক্ত করে বগলের নীচে চেপে ধরে আছেন।

এত রাতেও পিকাডিলিতে একটি ক্যাব পেয়ে গেলেন মি. গ্রেনিং। ওটাতে চড়ে তিনি কভেন্ট্রি, ক্রানবোর্ড হয়ে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হলেন গ্রেট কুইন স্ট্রীটে। ড্রাইভারকে ভাড়া দেওয়ার সময় বুঝতে পারলেন আসলে তিনি আবার হাজির হয়েছেন মি. ওয়েলসের সেই বাড়ির সামনে।

প্রাসাদোপম বাড়িটির সামনে কয়েক মুহূর্ত হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে থাকলেন মি. গ্রেনিং। যেন বুঝতে পারছেন না কী করে

এখানে হাজির হয়েছেন। এদিক ওদিক তাকালেন মি. গ্রেনিং। জনশূন্য রাস্তা। হঠাৎই যেন মনস্থির করে ফেললেন তিনি। কোটের কলার উঁচু করে মুখ ঢাকলেন, যেন কেউ তাঁকে এই অবস্থায় দেখে ফেললে ভারি লজ্জায় পড়ে যাবেন। তারপর এগিয়ে গেলেন অন্ধকার বাড়িটির সদর দরজার দিকে। পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করলেন মি. গ্রেনিং, একটি চাবি লেগে গেল তালায়, খুট শব্দে খুলে গেল। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন তিনি।

হলঘরটি লম্বা। একটিমাত্র আলো জ্বলছে, নগ্ন বাতিটি যেন ভেঙচি কাটল মি. গ্রেনিং-এর দিকে চেয়ে। কোন রকম ইতস্তত না করে মি. গ্রেনিং তাঁর ডান দিকের প্রথম দরজায় ঠেলা দিলেন। প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল ওটা, অন্ধকার একটি ঘর চোখে পড়ল আবছাভাবে। ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে এবার সোজা সামনের দিকে এগিয়ে চললেন তিনি। হলঘরের চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক কোন কিছুতেই হোঁচট খেলেন না, যেন অদৃশ্য এক শক্তি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল তাঁকে।

প্যাসেজের তৃতীয় দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন মি. গ্রেনিং। বগলের ছড়িটিকে আরও জোরে চেপে ধরলেন। তারপর ধাক্কা মেরে দরজা খুলে উঁকি দিলেন ভিতরে। রাস্তা দিয়ে ভেসে আসা আলোতে প্রায় স্পষ্ট দেখা গেল চাঁদোয়া খাটানো ওল্ড-ফ্যাশানের ভারি খাটটিকে। মি. গ্রেনিং এক মুহূর্ত মাথা বাড়িয়ে, আড়ষ্ট কাঁধ নিয়ে রোবটের মত দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর ভূতের মত নিঃশব্দ পায়ে ঢুকে পড়লেন ঘরের ভিতর।

বিশাল খাটটিতে একটি তরুণী শুয়ে আছে। তার মেঘের মত কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে বালিশময়। বড়বড় আঁখিপল্লবে মোড়া চোখ দুটো বোজা। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটির সুডৌল বুক দুটো ছন্দায়িত গতিতে উঠছে, নামছে। তার একটি হাত মাথার উপর ভাঁজ করা।

মেয়েটিকে দেখে মি. গ্রেনিং-এর কোন ভাবান্তর হলো না। তিনি নীরবে এবং ঠাণ্ডা চোখে মেয়েটিকে পর্যবেক্ষণ করলেন। কয়েক মিনিট মূর্তির মত একভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। তারপর ঠিক যন্ত্রের মত তাঁর ছড়িধরা ডান হাতটি উঠে গেল মাথার উপর। সামনের দিকে ঝুঁকলেন তিনি, লক্ষ্যস্থির করলেন, তারপর বিদ্যুৎবেগে ভারি কাঠের দণ্ডটি নামিয়ে আনলেন শিকারের মাথার উপর।

তীব্র গোঙানি বেরিয়ে এল তরুণীর মুখ থেকে, ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসল সে বিছানায়, খামচে ধরল বিছানার চাদর, তারপর গোঁ গোঁ করতে করতে আবার পড়ে গেল বালিশের উপর।

মি. গ্রেনিং বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে। আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে নিশ্চুপ, রক্তাক্ত শরীরটার দিকে চেয়ে। চেপে থাকা দাঁতের ফাঁক দিয়ে শ্বাস টানার মত একটা শব্দ বেরুল, ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি, ঘুরে দাঁড়ালেন, স্বপ্নচারী মানুষের মত ধীরগতিতে এগোলেন দরজার দিকে।

ওপারের ঘর থেকে ভয়ার্ত এক কণ্ঠ ভেসে এল: 'মিসেস ওয়েলস! আপনি ঠিক আছেন তো?'

পাশের একটি ঘরে ঢুকে পড়লেন মি. গ্রেনিং। বাইরের হলঘরে পৌঁছুলেন এভাবেই। হঠাৎ পেছনে ছুটন্ত পদশব্দ শুনে বিদ্যুৎ খেলে গেল তাঁর শরীরে, ভয়ঙ্কর এক চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে, পরক্ষণে দৌড় দিলেন সামনের দিকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে ফেললেন দরজা, মিশে গেলেন বাইরের অন্ধকারে।

স্যার হিউগ স্ট্যানওয়ে 'ফ্রাইডে টাইমস'-এর সর্বশেষ সংস্করণখানা ছুঁড়ে ফেললেন লাইব্রেরি টেবিলের উপরে, তাকালেন তাঁর বিপরীতে বসা নীরব লোকটির দিকে। গত রাতের আতঙ্ক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি মি. গ্রেনিং, তার ধূসর চুল কাকের বাসা, চোখের তারা বিস্ফারিত, বারবার চেয়ারের হাতল

মুঠি করে ধরছেন আর খুলছেন। 'আমি খুনী!' এই নিয়ে দশবার একই কথা উচ্চারণ করলেন তিনি।

স্যার হিউগ ভ্রূকুটি করলেন। 'তোমাকে আর কতবার বলব গ্রেনিং, তুমি ওরকম কিছু করোনি! এই পত্রিকায় গতরাতের সমস্ত ঘটনা ডিটেলস লিখেছে। মিসেস ওয়েলসের মাথা শুধু খানিকটা কেটে গেছে, অন্য কিছু নয়। বালিশের কারণেই বোধহয় এযাত্রা তিনি বেঁচে গেছেন, আঘাতটা জুৎসই ভাবে লাগেনি। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত যে গত পরশু দুপুরে যে লোকটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় একজনের মাথা ফাটালে, সেই লোকের বিধবা বউকেই কিনা গতরাতে হামলা করলে!'

'স্ট্যানওয়ে,' আর্তনাদ করে উঠলেন মি. গ্রেনিং, 'তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করো, আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব। ওই বাড়িতে ঢোকার পর থেকে নিজের ওপর আমার একবিন্দু নিয়ন্ত্রণও ছিল না। আরেকটা শক্তি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল, অথচ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ঘটনাগুলো কীভাবে ঘটছে। অসহায় একটি মেয়েকে ঘুমন্ত অবস্থায় আঘাত করা–গড, কী ভয়ঙ্কর!'

স্যার হিউগ খানিকক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থাকলেন তাঁর বন্ধুর দিকে। তারপর বললেন, 'তোমার এই ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর করার জন্যে আমি বেরিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোন ক্লু-টলু পাব। কিন্তু যে খবর জানতে পেরেছি সুস্থ মানুষের পক্ষে তা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

'তোমার এই ছড়ির আগের মালিক অর্থাৎ স্টিফেন ওয়েলস, ছিল খুবই ধনী। ওয়েলস ইস্ট ইন্ডিজ প্রোডাক্টস কোম্পানির একমাত্র মালিক এই স্টিফেন ওয়েলস। তার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয় তার স্ত্রী। ব্যবসায়ী হিসাবে সফল হলেও বিবাহিত জীবনে ওয়েলস স্বামী হিসেবে ছিল চরম অসফল। পুরুষ এবং নারীর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, তীব্র ঘৃণার কথা এর

আগেও শুনেছি আমি, কিন্তু এমনটি শুনিনি। স্বামীর মৃত্যুতে মেয়েটি এত স্বস্তি পায় যে সে তার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি তখনই নিলামে দিয়ে দেয়। অথচ বেচারী ওয়েলসের তখন পর্যন্ত দাফন কাফনের ব্যবস্থাও করা হয়নি।'

মি. গ্রেনিং ধীরে ধীরে মাথা তুললেন। 'এর সঙ্গে আমার ছড়ির সম্পর্ক কী?'

'প্রচুর। ওয়েলসের যে সব সম্পত্তি নিলামে দেয়া হয় তার মধ্যে তার খুব প্রিয় কিছু জিনিসপত্রও ছিল। ওগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে তোমার ওই ছড়ি। তো এই ছড়ি নিয়ে একটা গল্প আছে যেটা ওয়েলসের বন্ধুমহল থেকে জেনেছি আমি।

'ওয়েলস প্রায়ই তার ব্যবসার কাজে ইস্ট ইন্ডিজে যেত। সান্দাকান থেকে কিছুটা দূরে, উত্তর বোর্নিওতে সে একবার এক ওঝাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচায়। আদিবাসীটি বিশাল এক গোক্ষুরের কামড় খেতে যাচ্ছিল, ওয়েলস দূর থেকে গুলি করে সাপটাকে মেরে ফেলে। ওঝা এই ঘটনায় এতই অভিভূত হয়ে পড়ে যে সে ওয়েলসকে একটি অদ্ভুত জিনিস উপহার দেয়।

'জিনিসটি কাঠের, ডেথ-ট্রির শিকড় থেকে তৈরি। বোর্নিওর কিছু আদিবাসী অদ্ভুত উপায়ে তাদের আত্মীয়-স্বজনের লাশ দাফন করে, জানো গ্রেনিং? তারা প্রথমে একটি বড় গাছ খুঁজে বের করে, গুঁড়িতে বড় গর্ত খোঁড়ে, তারপর লাশটিকে বসা অবস্থায় কবর দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। গাছটি একটি জীবন্ত সমাধিস্তম্ভ হিসেবে বাড়তে থাকে। আর ওই গাছটি তখন আদিবাসীদের কাছে হয়ে ওঠে পরমপূজ্য কোন দেবতার মত।

'আর সেই কাঠের জিনিসটি তৈরি হয়েছিল অমনই একটি গাছের শিকড় থেকে। এই গাছের গুঁড়ির খোলে কবর দেয়া হয়েছিল ওই ওঝার পূর্ব-পুরুষ এক সাধুকে। গাছটি তখন থেকেই পরিচিতি লাভ করে বিপজ্জনক হিসেবে। ওদের বিশ্বাস এই গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি কোন জিনিস যার কাছে থাকবে সে সমস্ত

বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে এবং জিনিসটি শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিশোধ নিতে তাকে সাহায্য করবে।

'ওই ঘটনার দিন দুই পর ওয়েলস আদিবাসীদের ডিঙিতে চড়ে নদীপথে ফিরছে, হঠাৎ তার ওপর অ্যামবুশ করা হয়। "সামপিটান" ব্লো-গান থেকে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত বর্শার আঘাতে তিনজন আদিবাসী গাইড এবং একজন শ্বেতাঙ্গ মারা যায়। অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় ওয়েলস। ওঝার দেয়া কাঠের টুকরোটিই যেন তার প্রাণ বাঁচায়। বিষাক্ত একটি বর্শা ছুটে এসেছিল তার দিকে, কিন্তু কাঠের টুকরোটির সঙ্গে বেধে ওটা ছিটকে যায় অন্যদিকে।

'তীরে পৌঁছে ওয়েলস টুকরোটি দিয়ে ছড়ি তৈরি করে এবং প্রতিজ্ঞা করে জীবনেও সে এই ছড়িটিকে কাছ ছাড়া করবে না। এই প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা করেছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কারণ যেখানেই সে যেত, সঙ্গে নিত ওই ছড়ি।'

এক মুহূর্তের জন্য থামলেন স্যার হিউগ, মি. গ্রেনিং অধৈর্য গলায় বললেন, 'কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না–'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি,' বলে উঠলেন স্যার হিউগ। 'স্টিফেন ওয়েলসের কফিন বহনকারী যে লোকটিকে তুমি আঘাত করেছিলে তার নাম ফিলিপ গার্ন, এক কুখ্যাত জুয়াড়ী। সে-ই ওয়েলসের সংসারে অশান্তির আগুন জ্বেলেছিল। মিসেস ওয়েলসের সঙ্গে তার পরকীয়া প্রেমের কথা কারও জানতে বাকি নেই। মিসেস ওয়েলস তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আর এজন্য স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিতে সে কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু ওয়েলস রাজি হয়নি তালাক দিতে। গার্নকে স্বামীর কফিন বহন করতে দেওয়া মিসেস ওয়েলসের নিষ্ঠুর মানসিকতারই পরিচায়ক।

'এখন–' স্যার হিউগ চেয়ারে আঙুল দিয়ে ড্রাম বাজাতে বাজাতে বললেন, 'আমি কোন উপসংহার টানতে যাচ্ছি না। পুরো

ব্যাপারটাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছে। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যেভাবে তুমি বর্ণনা দিয়েছ তাতে মনে হয় ছড়িটি নিলাম থেকে কেনা বোধহয় তোমার নিয়তিতেই ছিল। কারণ প্রতিদিন তুমি গ্রেট কুইন স্ট্রীটে ওয়েলসের বাড়ির সামনে দিয়েই যেতে এবং সবসময় তুমি ছড়ি বহন করো। হয়তো এ জন্যই এই ছড়ির সঙ্গে তোমার ভাগ্য এক সুতোয় গাঁথা হয়ে গেছে।

গতরাতের মত আজ রাতেও প্রায় একই স্বপ্ন দেখলেন মি. গ্রেনিং। কিন্তু এবারের স্বপ্নে একটি বাড়তি ঘটনা যোগ হলো এবং স্বপ্নটি এমন জীবন্ত ছিল যে পরদিন নাস্তার টেবিলে তিনি স্যার হিউগের কাছে ঘটনাটি না বলে পারলেন না।

'ঠিক মাঝরাতে যেন দরজায় কলিংবেলের শব্দ শুনলাম আমি,' শুরু করলেন মি. গ্রেনিং। 'শব্দটি এত স্পষ্ট যে জেগে আছি মনে হলো। বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি নামলাম, তোমার দেওয়া ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চড়িয়ে হলঘরের দিকে দ্রুত পায়ে এগোলাম।

'দরজা খুলতেই চৌকাঠে দু'জন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমি। এমন অদ্ভুত জুটি জীবনেও দেখিনি। একজন লম্বা, দেখে মনে হলো ইংরেজ, কিন্তু পরনের পোশাকটি বড়ই অদ্ভুত। সাদা হাঁসের পালকের তৈরি একটি পোশাক পরে ছিল লোকটা, মাথায় গাছের ছালের তৈরি হেলমেট। মুখটা একেবারে রক্তশূন্য, সাদা। আর তার চোখ! ওহ্, স্ট্যানওয়ে, তার চোখের জায়গায় দুটো কালো গর্ত ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তার দিকে তাকিয়ে পিছু হটতে শুরু করলাম। আর তার সঙ্গী যেন উঠে এসেছে বইয়ের পাতা থেকে। কোন আদিবাসী হবে নিশ্চয়ই, কোমরে খালি এক টুকরো কাপড় জড়ানো, মাথায় পালকের তৈরি অদ্ভুত একটি মুকুট। তার বাঁ হাতে একটি শুকনো,

মরা সাপ।

'তারা ভেতরে ঢুকল, শ্বেতাঙ্গ লোকটি খুব স্বাভাবিক গলায় বলল: "আমরা ছড়িটি নিতে এসেছি!"'

স্যার হিউগ ঠাস্ করে চায়ের কাপটি নামিয়ে রাখলেন টেবিলের উপর, তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

'ওই স্বপ্নের মধ্যে,' বললেন তিনি, 'তুমি কী দেখেছ ওদেরকে ছড়িটি দিয়ে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ, আমি–'

ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন স্যার হিউগ, দৌড়ে গিয়ে ঢুকলেন ভিতরের ঘরে ছাতা রাখার আলমিরার কাছে। ছোট দরজাটি একটানে খুললেন তিনি, উঁকি দিলেন। গত রাতে, যে র‍্যাকটিতে ছড়িটি ঝোলানো ছিল, ওটা খালি!

ঝড় তুলে ঘর থেকে বেরুলেন স্যার হিউগ, ছুটে গেলেন হলঘরের দিকে। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসলেন, কার্পেট পরীক্ষা করতে লাগলেন। দরজার কাছে, কার্পেটহীন জায়গাটুকু পরীক্ষা করতে গিয়ে বিস্ময়সূচক ধ্বনি বেরোল তাঁর দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

মেঝেতে স্পষ্ট ফুটে আছে কাদামাখা মানুষের পায়ের ছাপ!

'কুইক, গ্রেনিং,' দ্রুত ঘুরলেন স্যার হিউগ তাঁর বন্ধুর দিকে। তিনি স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছেন পায়ের ছাপগুলোর দিকে। 'এক মুহূর্ত নষ্ট করার সময় নেই। শিগ্গির চলো।' মি. গ্রেনিংকে প্রায় হিঁচড়ে নিয়ে বেরোলেন স্যার হিউগ।

পিকাডিলির রাস্তা ধরে ছুটছে ক্যাব, স্যার হিউগ নীরব, অস্থির চোখে তাকিয়ে থাকলেন বাইরের দিকে। মাত্র একবার তিনি নীরবতা ভাঙলেন, তাও ড্রাইভারকে জোরে চালাতে বলার জন্য।

গ্রেট কুইন স্ট্রীটে এসে ঢুকল ক্যাব। একটু পরেই উইন্ডশিল্ডে ছবির মত ফুটে উঠল তাঁদের গন্তব্যস্থান, ওয়েলসের বাড়ি। কিন্তু

বাড়ির সামনে বেশ ভিড়।

দৃশ্যটা এক নজর দেখেই হাতের তালুতে প্রচণ্ড জোরে ঘুসি বসালেন স্যার হিউগ।

'ওহ্, গ্রেনিং, অনেক দেরি হয়ে গেছে!' হতাশ গলায় বললেন তিনি।

ক্যাব থেকে নেমে ভিড় ঠেলে এগোতে শুরু করলেন দু'জনে। সামনে এসে যে দৃশ্য দেখলেন, মি. গ্রেনিং-এর মনে হলো তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

ফুটপাতের উপর দুটো রক্তাক্ত শরীর শোয়ানো। একটি পুরুষ, অন্যটি নারী। পুরুষটি ফিলিপ গার্ন, যাকে কফিন বহন করার সময় আক্রমণ করেছিলেন মি. গ্রেনিং। আর নারীটি মিসেস ওয়েলস। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল দু'জনেই মারা গেছে। ওদের মাথা দুটো কেউ ভয়ঙ্কর আক্রোশে পিটিয়ে ছাতু করে ফেলেছে।

স্যার হিউগ নোটবুক হাতে, রাস্তার একপাশে দাঁড়ানো লম্বা, রোগা একটি লোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গুড মর্নিং, ইন্সপেক্টর মেলটন, আমাকে চিনতে পারছেন?'

লোকটি স্যার হিউগের দিকে ফিরলেন। মাথা ঝাঁকালেন। চিনতে পেরেছেন। বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি তো–'

'এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা কী করে ঘটল বলুন তো?' তাড়াতাড়ি জানতে চাইলেন স্যার হিউগ।

ইন্সপেক্টর মেলটন ভ্রূ কোঁচকালেন। 'জোড়া খুন,' সংক্ষেপে বললেন তিনি। 'এমন অদ্ভুত কেস জীবনেও পাইনি আমি। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যা শুনেছি তা এককথায় অবিশ্বাস্য।'

'হত্যাকাণ্ড?'

'হ্যাঁ। লোকটাকে তো আপনি চেনেনই। ফিলিপ গার্ন। মিসেস ওয়েলসের প্রণয়ী ছিল সে। ওরা দুজন সাসেক্স থেকে লন্ডন ফিরছিল। কেউ বোধহয় ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওরা ক্যাব থেকে বেরুনো মাত্র পেছন থেকে

দু'জনের মাথাতেই একটা ছড়ি দিয়ে হামলা চালায় খুনী। ছড়িটাকে রাস্তায় পেয়েছি আমরা। কিন্তু ঘটনাটার সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো ড্রাইভার ওই সময় নাকি রাস্তায় কোন লোকজনই দেখেনি। সে ওদের নামিয়ে সবে কয়েক গজ এগিয়েছে, এই সময় একই সঙ্গে দুটো আর্তচিৎকার শুনে সে গাড়ি ঘুরিয়ে এসে দেখে ওরা দু'জন পড়ে আছে ফুটপাতের ওপর। কাউকে নাকি, ড্রাইভার শপথ করে বলেছে, ধারে কাছেও দেখেনি সে। এটা নিঃসন্দেহে অদ্ভুত একটা ব্যাপার, কী বলেন?'

স্যার হিউগ আস্তে মাথা দোলালেন। 'ধন্যবাদ, ইন্সপেক্টর,' বললেন তিনি। 'এসো, গ্রেনিং, চলো যাই।'

১২ অক্টোবর, সোমবার, লন্ডন নিউজ-ক্রনিক্‌ল-এর সান্ধ্য সংস্করণের তৃতীয় পৃষ্ঠার নীচের দিকে বেরোল খবরটা:

গ্রেট কুইন স্ট্রীটে ঘটে যাওয়া অমীমাংসিত করুণ ঘটনাটি সম্পর্কে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসাররা সম্প্রতি একটি তথ্য আবিষ্কার করেছেন। পাঠকদের মনে থাকতে পারে এই ঘটনার শিকার ছিলেন মিসেস স্টিফেন ওয়েলস এবং মি. ফিলিপ গার্ন। দুজনকেই একটি ছড়ি দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে অজানা এক খুনী।

ওয়েলস ইস্ট ইন্ডিজ প্রোডাক্টস কোম্পানির মৃত মালিক স্টিফেন ডব্লিউ ওয়েলসের বিধবা ছিলেন মিসেস ওয়েলস। কিছুদিন আগে মি. ওয়েলসও মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ওয়েলসের বন্ধুমহলে এই কথা ওঠে যে, ওয়েলসের মৃত্যুর কারণ হিসাবে হৃদরোগকে দেখানো হলেও তা খুবই সন্দেহজনক। কারণ মি. ওয়েলস ছিলেন অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। পরবর্তীতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এই কেস গ্রহণ করে এবং পুনরায় মি. ওয়েলসের পোস্টমর্টেম করা হয়। সেই ফলাফল, এই প্রথমবার জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে মি. ওয়েলস

আসলে মারা গেছেন বিষ প্রয়োগে।

আরও অনুসন্ধানে জানা যায় মিসেস ওয়েলস তাঁর প্রতিবেশীর এক ওষুধের দোকান থেকে স্ট্রিকনিন নামে এক শিশি মারাত্মক বিষ ক্রয় করেন। মিসেস ওয়েলসকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তলব করেছিল। কিন্তু এই সময়ই তিনি হঠাৎ করে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

মূল গল্পঃ কার্ল জ্যাকবির 'দ্য কেন'

কেউ ফিরে আসে

ঘরটি ধবধবে সাদা। দেয়াল এবং ছাদ সাদা রঙের। সমস্ত আসবাব সাদা। এমনকী পর্দা ও বেড কাভারও একই রঙের। মেঝেতে চমৎকারভাবে ফিট করা নরম, মোটা কার্পেট যেন সাদা ঘাসের মাঠ। সাদা উইন্ডো-সিলের উপরে সাদা রঙের ফ্লাওয়ার ভাস, তাতে সাদা টিউলিপ। ফুলের সবুজ পাতা আর বোঁটাই শুধু ভিন্ন রঙের সামান্য আভাস ফুটিয়েছে ঘরে। এ ছাড়া সারা ঘরে সাদা রঙের ঝলসানি, তবে সাদার বিভিন্ন শেড রয়েছে বলে রঙটাকে একঘেয়ে লাগে না। দরজা-জানালার চৌকাঠ, ঘরের লম্বালম্বি তল বা স্কার্টিং বোর্ড এবং আসবাবগুলো ঝলমলে সাদা রঙের। দেয়াল আর ছাদ ম্যাট হোয়াইট। আর সূর্যের আলোর তৈরি ছায়ার কারণে সাদা রঙটা কোথাও কোথাও ধূসর বর্ণ পেয়েছে।

মেয়েটি সাদা সামার ড্রেস আর জুতো পরে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে, তার ছোট করে ছাঁটা, কোঁকড়ানো চুলও সাদা রঙের। সে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে ঘরটি যেন বিশেষভাবে আমার জন্যেই সাজানো হয়েছে। দারুণ লাগছে! ভাড়া কত?'

বাড়িঅলা ভাড়ার অঙ্কটা জানাল তাকে। বেশ মোটা টাকা ভাড়া। তবে এত সুন্দর গোছানো বাড়ির জন্য তেমন গায়ে লাগল না মেয়েটির। আগের বাড়িটির তুলনায় এ তো রীতিমত স্বর্গ। সে সিদ্ধান্ত নিল বাড়িটা নেবে।

'এক মাসের ভাড়া কিন্তু অ্যাডভান্স দিতে হবে,' হাসল বাড়িঅলা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে। আন্তরিক, উষ্ণ হাসি।

'দেব!'

'বেশ। তা হলে বাকি ফর্মালিটিজগুলো সেরে ফেলি। আসুন।'

দশ মিনিটের মধ্যে বাড়িঅলাকে একটা চেক লিখে দিল মেয়েটি, ভাড়ার রশিদ নিল, সেই সাথে সদর দরজার চাবি। সাদা ঘরটির আলাদা চাবি আছে। ওটাও পেল সে। বাড়িঅলা জানাল যখন ইচ্ছে সে তার নতুন বাড়িতে উঠে আসতে পারে। বাড়িঅলা থাকে অন্য জায়গায়। সেখানকার ঠিকানা এবং ফোন নম্বর দিয়ে জানাল যে-কোন প্রয়োজনে মেয়েটি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। 'কোন সমস্যা হলে আমাকে বলবেন,' বলল সে।

মেয়েটি যাবার সময় যোগ করল, 'দোতলার ঘরগুলো এখনও খালি পড়ে আছে। আশা করি একা থাকতে ভয় করবে না আপনার।'

'আরে নাহ্,' হাসল মেয়েটি। 'বরং একা থাকতেই ভাল লাগবে। আমি নির্জনতা ভালবাসি। চাই শান্তি।'

মেয়েটি জানত না সাদা ঘরটি যে মুহূর্তে ভাড়া নিয়েছে, সে মুহূর্ত থেকে শান্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে তার জীবন থেকে।

দিন দুই পরে নতুন বাড়িতে উঠে এল মেয়েটি। সঙ্গে মালপত্র তেমন নেই। একা থাকে বলে মন না টিকলে প্রায়ই বাসা বদল করে সে। তাই অতিরিক্ত মালের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে চায়। মালপত্র ঘরে নেওয়ার সময় একটু পরপর ম্যান্টলপিসের উপরে রাখা সাদা ফ্রেমের আয়নায় নিজেকে কয়েক ঝলক দেখে নিল সে। তার পরনের সাদা পোশাক এবং সাদা চুল সাদা ঘরটির সাথে বেশ মানিয়ে গেছে, নিজেকে এ ঘরের একটা অংশ বলে মনে হচ্ছে। সেই সাথে কেমন অদ্ভুত এবং অপার্থিবও লাগছে।

বিকেলের দিকে মেয়েটি বেরুল কিছু কেনাকাটা করতে। টিউলিপগুলো শুকিয়ে গেছে, সে কয়েকটি সাদা গোলাপ কিনল।

খুশি মনে ফিরে এল বাড়িতে। ঢুকল নিজের ঘরে। এবং চমকে উঠল। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কেউ।

এক মহিলা। পরনে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা কালো আলখেল্লা। তার লম্বা, কালো মসৃণ চুল কোমর ছুঁয়েছে। মানুষ না, যেন পাথরের মূর্তি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আপনি কে? ভেতরে ঢুকলেন কী করে!' বিস্মিত নতুন ভাড়াটে।

'এটা আমার ঘর,' জবাব এল।

'না। আপনি ভুল করছেন। এটা আমার ঘর।'

'আমি বাইরে ছিলাম। কিন্তু এ ঘরের মালিক এখনও আমি। আমার কাছে চাবিও আছে,' বলল অপরজন।

'আপনি বোধহয় অনেকদিন বাইরে ছিলেন, তাই খেয়াল করেননি সমস্ত বাড়ি নতুন ভাবে সাজানো-গোছানো হয়েছে। হয়তো ভাড়াও বাকি পড়েছিল আপনার। তাই বাড়িঅলা আমাকে এ ঘর ভাড়া দিয়েছেন। আপনি বরং বাড়িঅলার সাথে কথা বলুন।'

'বাড়িঅলার সাহস কত ঘরটার রঙ বদলে এরকম বিশ্রী সাদা করে ফেলেছে,' বলল মহিলা। 'এ ঘরের রঙ ছিল কালো। সম্পূর্ণ কালো।'

'হয়তো বাড়িঅলা ভেবেছেন আপনি আর ফিরে আসবেন না।' মেয়েটি মহিলার দিকে এক মুহূর্তের জন্য পেছন ফিরে দাঁড়াল ফ্লাওয়ার ভাসে গোলাপ রাখতে গিয়ে। লক্ষ করল তার হাত কাঁপছে।

'এটা এখন আমার ঘর। দয়া করে আপনি চলে যান।' ঘুরল সে।

চলে গেছে মহিলা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মেয়েটি। কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে। হলঘরে গেল। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল দোতলার

শূন্য ঘর থেকে কোন শব্দ আসে কিনা। হয়তো মহিলা দোতলায় গেছে। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

সাদা ঘরে ফিরে এল মেয়েটি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লক্ষ করল ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করবার জন্য ছোট একটা খিল আছে, সাদা রঙ করা। সে খিলটা টেনে দিল। আমি যখন ঘরে থাকব তখন অন্তত মহিলা এ ঘরে ঢুকবার সুযোগ পাবে না, ভাবল সে।

উত্তেজনা কমাতে সে কালো কফি বানাল। এ ঘরে এই প্রথম কালো রঙ দেখা গেল–কালো আলখেল্লা পরা ওই মহিলা। সে মহিলার কথা আর না ভাববার চেষ্টা করল। রাতে কিছু খেল না। দিন দিন খাওয়া কমে যাচ্ছে তার। খিদেই যেন পায় না।

মহিলার কথা ভাবতে না চাইলেও অবচেতনে মহিলাকে নিয়ে তার একটা চিন্তা ছিলই। তাই রাতে সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল তার সাদা ঘর কালো রঙের ঘরে পরিণত হয়েছে। কালো দেয়াল এবং ছাদ। কালো পর্দা ও কার্পেট। কালো বিছানার চাদর ও বেডকাভার। সে ওই বিছানায়, কালো বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে, তার সাদা চুলের রঙ বদলে কালো এবং লম্বা হয়ে গেছে, পরনে কালো নাইট ড্রেস। স্বপ্নে যে রকম ঘটে, দ্বৈত সত্তার মাঝে রয়েছে সে: নিজেকে সে দেখতে পাচ্ছে। তবে সে হয়ে গেছে বিকেল বেলার সেই মহিলা আর ওই মহিলার রূপান্তর ঘটেছে তার চেহারায়। সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল।

স্বপ্নের মধ্যে খুলে গেল কালো দরজা। তবে এ দরজায় কোন খিল বা হুড়কো নেই। একটা কালো ছায়ামূর্তি যেন ভেসে এল পাতলা, কালো বাতাসে; পুরুষের অবয়ব। ছায়ামূর্তিটি এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। জানালা থেকে ভেসে আসা চাঁদের আলোয় ছায়ামূর্তির হাতে একটা ছোরার ফলা ঝলসে উঠতে দেখল সে। ভয়ে তার শরীর কাঠ হয়ে গেল। টের পেল ঠাণ্ডা, ধারাল কিছু একটা *ঠেকেছে* গলায়। চোখের সামনে বিস্ফোরিত হলো টকটকে

লাল একটা পদার্থ। আর্তনাদ করে উঠল সে–এবং জেগে গেল।

ঘরটি সাদাই আছে। তার পরনে সাদা নাইট ড্রেস। কিন্তু স্বপ্নটা এমন বাস্তব মনে হচ্ছিল, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল সে বিছানায়। জ্বালল বিদ্যুৎ বাতি। তাকাল আয়নার দিকে। তার গলায় হালকা লাল রঙের একটা দাগ, যেন ধারাল ছোরার ফলা মৃদু ছুঁয়ে গেছে ওখানটাতে। দাগটা কোত্থেকে এল? তার মানে কি স্বপ্নটা বাস্তব ছিল? তা হলে স্বপ্নের সেই অপরজনের কী হলো?

স্বপ্ন-আতঙ্কে সারাটা দিন সিটিয়ে থাকল মেয়েটি। রাস্তায় হাঁটতে বেরুল ভয় দূর করতে। বাসায় ফিরে এল উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে–যদি আগের ভাড়াটে আবার ফিরে আসে!

না। কেউ নেই ঘরে। ঘরের খিল লাগিয়ে দিল সে। আতঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল আরেকটা রাতের জন্য।

রাতকে যতই ভয় পাও, সে আসবেই। সময় অতিবাহিত হলো তার নিজস্ব গতিতে, ঘরের মধ্যে ছায়া পড়ল। পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়তে শুরু করেছে সূর্য, ধূসর আলোকে দূর করে দিয়ে প্রকৃতিকে গ্রাস করল অন্ধকার। রাত বাড়ল। চলে এল ঘুমের সময়। মেয়েটি বিছানায় গেল। তবে চোখ বিস্ফারিত করে শুয়ে রইল। ভয় লাগছে ঘুমুতে। কিন্তু জেগে থাকবার চেষ্টা করলে আরও বেশি করে ঘুম আসে। মেয়েটিরও দু'চোখের পাতা বুজে এল। এবং স্বপ্ন দেখল সে। এটা যেন গত রাতের স্বপ্নের দ্বিতীয় পর্ব। সেই কালো ঘরটিতে আবার শুয়ে আছে সে। আলো জ্বলছে। সে বিছানায় পড়ে রয়েছে চিৎ হয়ে, গলা দিয়ে এখনও রক্ত ঝরছে। সেই লোকটা কালো কার্পেট থেকে রক্ত মুছতে ব্যস্ত। কাজটা নিখুঁতভাবে সারল সে, রক্তাক্ত বিছানার চাদর দিয়ে পেঁচাল মেয়েটিকে, অরপর কাঁধে তুলে নিল। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারে। মেয়েটি দেখছে তাকে নিয়ে লোকটা এগোল একটা গাড়ির দিকে. পেছনের সিটে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গাড়ি

চালিয়ে শহরের বাইরে চলে এল লোকটা। ঢুকল একটা জঙ্গলে। মেয়েটিকে বের করে আনল গাড়ি থেকে, শোয়াল মাটিতে। লোকটা একটা কোদালও এনেছে। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল সে। তৈরি হয়ে গেল একটা কবর। কবরের মধ্যে শুইয়ে দিল মেয়েটিকে। কাজগুলো সে করল নীরবে, দক্ষতার সাথে এবং সন্তুষ্টচিত্তে। তবে একবারের জন্যও তার চেহারা দেখতে পায়নি মেয়েটি।

লোকটা কবরে মাটি ফেলা প্রায় শেষ করেছে, এমন সময় মেয়েটির মনে হলো সে অপরজন হয়ে গেছে। চিৎকার করে বলতে চাইল, 'না-না, তুমি ভুল মেয়েকে কবর দিচ্ছ–আমি মরিনি–' কিন্তু গলায় কোন স্বর ফুটল না তার। তবে ঘুমের মধ্যে গোঙাচ্ছিল সে, আর গোঙানির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। জেগে উঠল সে সাদা ঘরে।

নিজের ঘরে আছে দেখে প্রথমে স্বস্তি অনুভব করল মেয়েটি। পরমুহূর্তে আতঙ্ক গ্রাস করল তাকে। কারণ ঘরে একা নয় সে। কালো আলখেল্লা পরা সেই মহিলা দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে। তার মানে মহিলা খুন হয়নি, যেমনটি সে দেখেছে স্বপ্নে। কিন্তু এ মহিলা ঘরে ঢুকল কী করে! দরজা তো বন্ধ। একমাত্র ভূতের পক্ষেই সম্ভব বন্ধ দরজা দিয়ে…

'তুমি বাস্তব নও। তুমি প্রেতাত্মা।' কে কথা বলল, সে নাকি অপরজন? মহিলা ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দুঃস্বপ্নটা নিয়ে ভাবতে লাগল মেয়েটি। তার বারবার মনে হচ্ছে সে স্বপ্নে যা দেখেছে তা স্বপ্ন নয়, বাস্তব। ওই মহিলাকে কেউ খুন করেছে। আর সেই খুনের দৃশ্যই বারবার ফিরে আসছে স্বপ্নে। স্বপ্নের মধ্যে সে নিজেই ভিক্টিম হয়েছে। দেখেছে ওই মহিলা কীভাবে খুন হয়েছে। কিন্তু কেন? এরকম স্বপ্ন দেখবার মানে কী? সে ওই মহিলা বা খুনী কাউকেই চেনে না। সম্ভবত এ ঘরটার কারণে স্বপ্ন দেখছে সে। এটা একটা কারণ হতে পারে।

আরেকটা কারণ হতে পারে ইদানীং খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ খুব কমিয়ে দিয়েছে সে। কম খেলে নাকি লোকে উদ্ভট সব স্বপ্ন দেখে। শামানরা তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মার সাথে যোগাযোগ করবার সময় না খেয়ে থাকেন, শুনেছে মেয়েটি।

'তুমি কে? কে তোমাকে গলা কেটে জঙ্গলে কবর দিয়েছে?' জোর গলায় প্রশ্ন করল সে।

নিস্তব্ধ প্রকৃতির নীরবতা ফিরে এল জবাব হয়ে।

মেয়েটি নেমে পড়ল বিছানা ছেড়ে, পান করল কালো কফি। এখনও কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। পোশাক পরল সে। সাদা একটা স্কার্ফ পেঁচিয়ে নিল গলায়, লাল দাগটা যাতে বোঝা না যায়। গতকাল অনেকেই কৌতূহলী চোখে তাকিয়েছে তার দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা খবরের কাগজের দোকানের সামনে চলে এল মেয়েটি। একটা কাগজ কিনল, এ কাজটা সে করেই না বলতে গেলে। আজ কেন করল? এ প্রশ্নের জবাব অবশ্য পেয়ে গেল সে শীঘ্রি। একটা হেডলাইন নজর কাড়ল তার।

জঙ্গলে মহিলার লাশ

মেয়েটি পড়ল: একদল বাচ্চা জঙ্গলে পিকনিক করতে গিয়ে এক মহিলার লাশ খুঁজে পেয়েছে। বাচ্চাদের বাবা-মারা তাদেরকে মাটি খুঁড়ে আবর্জনা ফেলে আসতে বলেছিলেন। বাচ্চারা 'কবর খোঁড়া' নামে নতুন এ খেলায় উৎসাহ পেয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে। আর মাটি খুঁড়তে গিয়ে পেয়ে যায় মহিলাটির লাশ। ছেঁড়া, কালো কাপড়ে মোড়া ছিল লাশ, চাদরের গায়ে শুকিয়ে ছিল রক্ত। লাশের পরনের কালো কাপড়ের তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে ধারণা করা হচ্ছে ওটা নাইট ড্রেস ছিল। লাশের মাথায় লম্বা, কালো চুল। তবে মহিলার পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। পুলিশের ধারণা, অন্তত দুই কি তিন মাস আগে মহিলাকে কবর দেওয়া হয়েছে।

এখন কী করবে মেয়েটি? পুলিশের কাছে গিয়ে তার দুঃস্বপ্নের কথা বলবে? জানাবে স্বপ্নে দেখেছে এক মহিলাকে খুন হতে যার সঙ্গে জঙ্গলের এ লাশ মিলে যায়? কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পেল সে, পুলিশ তার কথা শুনে হাসছে এবং চাপা গলায় মন্তব্য করছে, 'ওহ্ গড, আরেকটা পাগল।'

মেয়েটির মনে পড়ে গেল বাড়িঅলা বলেছিল কোন প্রয়োজন হলে তার সাথে যেন যোগাযোগ করে। সে পাবলিক কল বক্সে গিয়ে বাড়িঅলাকে ফোন করল। পাওয়া গেল তাকে। নিজের নাম বলে যোগ করল, 'দয়া করে আসুন। আপনার সাহায্য দরকার।'

বিকেল বেলা চলে এল বাড়িঅলা। মুখে সেই মিষ্টি হাসি। তাকে দেখে স্বস্তি লাগল মেয়েটির।

'কী হয়েছে?' হাসিমুখে জানতে চাইল বাড়িঅলা। 'লাইট ফিউজ হয়ে গেছে? নাকি পানির মেশিন নষ্ট?'

'না, না। ওসব কিছু না। অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে, জানেন। আচ্ছা, এ ঘরের রঙ কি কালো ছিল?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?'

'আমি একটা স্বপ্নে দেখেছি–না, দুটো স্বপ্ন। আমার আগে কে থাকত এ বাড়িতে?'

বাড়িঅলার চেহারায় করুণ একটা ছাপ ফুটল, তারপর ছোট্ট করে কাঁধ নাচাল। 'আপনার কাছে লুকিয়ে রেখে লাভ নেই। এখানে আমার স্ত্রী থাকত। আমি আর আমার স্ত্রী। তবে দু'জনে আলাদা ঘরে ঘুমাতাম। এ ঘরটা ছিল তার। সে পুরো ঘরে কালো রঙ করে। বলত সে নাকি "জীবনের জন্যে শোক করছে।" এটা চেখভের একটা গল্পের লাইন। আমার স্ত্রী বাস্তবের চেয়ে বইয়ের জগতেই বাস করত বেশি। ও ছিল খুব খামখেয়ালী স্বভাবের।'

'তারপর কী হলো?'

'সে আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আমাকে না বলেই অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। ওর জন্যে অনেক দিন অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আর ফিরে এল না সে। শেষে ওর আশা ছেড়ে দিলাম। এ বাড়ি ভাল লাগছিল না আমার। তাই শহরের বাইরে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম আর এ বাড়ি ভাড়া দেব ঠিক করলাম। কালো রঙ আমার ভয়ানক অপছন্দের। তাই কালো রঙ মুছে আমার স্ত্রীর ঘরটিকে সাদা রঙ করে ফেললাম।'

'আপনার স্ত্রীর আর খোঁজ পাননি?'

'না।'

'আমার মনে হয় উনি মারা গেছেন। খুন হয়েছেন। আমি তাঁর ভূত দেখেছি। দুইবার।'

চুপ করে রইল বাড়িঅলা কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'আপনার বোধহয় শরীরটা ভাল নেই।'

'তার পরনে ছিল লম্বা, কালো আলখেল্লা, মাথায় কালো, লম্বা চুল।'

মাথা ঝাঁকাল বাড়িঅলা। চেহারা বিবর্ণ। 'আমার স্ত্রী ওই রকম পোশাকই পরত। তার কালো চুল ছিল কোমর পর্যন্ত।'

শান্ত গলায় বলে যেতে লাগল মেয়েটি, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম এক লোক তাকে গলা কেটে হত্যা করছে, তারপর লাশ কবর দিল জঙ্গলে। তার লাশের খোঁজ পাওয়া গেছে। এই যে আজকের পেপারে ছেপেছে খবরটা।' কাগজটা বাড়িঅলাকে দেখাল সে।

'আপনি আপনার স্ত্রীর যে বর্ণনা দিলেন তার সঙ্গে আমার স্বপ্ন দৃশ্য হুবহু মিলে যায়। আমার কথা বিশ্বাস করুক বা না করুক আমি পুলিশের কাছে যাব। বেহুদা ঘরে বসে থাকার কোন মানে হয় না। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন? ওদেরকে তদন্তের কাজে হয়তো সাহায্য করতে পারবেন–' থেমে গেল মেয়েটি, লোকটার চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে লক্ষ করে।

হাসিখুশি মুখটা পাথরে পরিণত হয়েছে, সেখানে ফুটে উঠেছে জান্তব, নিষ্ঠুর একটা ভাব। হিম গলায় সে বলল, 'তুমি, মাই ডিয়ার লেডি, তোমাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না।'

আর হঠাৎ করেই যেন স্বপ্নটা ফিরে এল বাস্তব হয়ে। মেয়েটি বুঝতে পারল সে যা দেখছে তা সত্যি সত্যি ঘটছে। চোখের সামনে, গ্রীষ্মের সূর্যের আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে যে ধারাল ছুরির ফলা, ওটা মোটেই অবাস্তব নয়। ছুরিটা বসে গেল তার গলায়, সেই লালচে দাগটার উপরে। ঘরে ঢুকেই স্কার্ফটা খুলে ফেলেছিল সে। সংক্ষিপ্ত একটি মুহূর্তের জন্য মেয়েটি দেখতে পেল সাদা কার্পেটে ছিটকে পড়েছে রক্তের ফোঁটা, তারপর গোটা ঘর লাল হয়ে গেল, যেন রক্ত দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাল আভাটা কালচে হয়ে এল। গাঢ় রঙ ধারণ করল। তারপর মিশমিশে কালো একটা গহ্বর দেখতে পেল সে, বনবন করে ঘুরছে। লোকে বলে ওই কালো গুহায় যে একবার ঢুকে যায় সে আর ফিরে আসে না। তবে কেউ কেউ ফিরে আসে···

মাস কয়েক পরের ঘটনা। শরতের এক ঠাণ্ডা দিনে, লাল রঙের সুট পরা; লাল চুলের একটি মেয়ে এল একটি বাড়ি দেখতে। বাড়িটির একটি ঘর লাল রঙ করা। দেয়াল এবং ছাদের রঙ লাল। আসবাবপত্র লাল রঙের। পর্দা, বিছানার চাদর, কার্পেট সবই লাল রঙের। লাল উইন্ডো-সিলের উপরে এক তোড়া লাল টিউলিপ···

'দেখে মনে হচ্ছে ঘরটি যেন বিশেষ ভাবে আমার জন্যেই সাজানো হয়েছে। দারুণ লাগছে! ভাড়া কত?' জানতে চাইল মেয়েটি।

বাড়িঅলা ভাড়ার অঙ্কটা বলল তাকে। মেয়েটি ভাড়া নিল ঘর। কয়েকদিন পরে সে উঠে এল নতুন বাসায়। জিনিসপত্র রেখে গেল টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা করতে। টিউলিপগুলো

শুকিয়ে গেছে বলে কয়েকটা লাল গোলাপ কিনল সে। তারপর ফিরে এল বাড়িতে। নিজের ঘরে ঢুকল। এবং চমকে উঠল। কেউ দাঁড়িয়ে আছে ঘরে।

সাদা পোশাক পরা এক তরুণী। সাদা সামার ড্রেস, পায়ে সাদা জুতো। তার সাদা, কোঁকড়ানো চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। পাথরের মূর্তি যেন একটা, স্থির তাকিয়ে আছে লাল চুলের মেয়েটির দিকে।

'তুমি কে? ভিতরে ঢুকলে কী করে?' বিস্মিত নতুন ভাড়াটে।

'এটা আমার ঘর,' জবাব এল।

মূলঃ রোজমেরী টিম্পারলির 'সাম ট্রাভেলার্স রিটার্ন।'

ভৌতিক হাত

প্যাকেজটা এসে পৌঁছুল পনেরোই আগস্ট। মার্টিন ক্রেডের ওয়েস্ট-স্টার্লিং হাউজে বেড়াতে আসার আগে লন্ডনে আমার বাড়ির চাকরটাকে এখানকার ঠিকানাটা দিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও খবর থাকলে আমাকে যেন জানায়। সন্দেহ নেই ছোকরা চাকর আমার খুবই কাজের। আসল জিনিসটা গুরুত্ব বুঝে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্যাকেজটা এসেছে সাউদাম্পটনের ব্রিস্টল কোম্পানি থেকে। জিনিসটা ফুট তিনেক লম্বা, খুবই শক্তিশালী একটা টেলিস্কোপ। কোম্পানিকে আগেই আমি এটার জন্য বারো পাউন্ড শোধ করে দিয়েছি। প্যাকেজটার সঙ্গে ছোট্ট একটা চিরকুটও চোখে পড়ল। ওতে লেখা: প্রিয় মি. ব্রকটন!

আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনি যে ফরাসি লো মারে স্কোপ চেয়েছিলেন ওটার মজুত ইতোমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় আমরা স্যাম্পল হিসাবে একই গুণগত মানের আরেকটি টেলিস্কোপ পাঠালাম। উল্লেখ্য, এ ধরনের টেলিস্কোপ আমরা সাধারণত তৈরি করি না। এই টেলিস্কোপটির নির্মাতা হোসে আনাল্টা, লিসবনের বিখ্যাত চশমা নির্মাতা। এটি তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তৈরি করে গেছেন। আমরা আশা করছি আমাদের এই টেলিস্কোপটি আপনার যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে। ব্রিস্টল অপটিক্যাল কো. লিমিটেড।

মার্টি ক্রেডের দিকে চিঠিটি এগিয়ে দিলাম আমি। সে দ্রুত কাগজটায় একবার নজর বুলিয়ে ছুঁড়ে ফেলল টেবিলের উপর।

'এখনও আগের অভ্যাস তোমার যায়নি দেখছি, ব্রকটন? এই নিয়ে তিন ডজন টেলিস্কোপ জোগাড় করেছ তুমি। এগুলো দিয়ে আসলে কী করো তুমি?'

হাসলাম আমি। 'সংগ্রহে রেখে দেই। অপটিকসের জগৎ আমার কাছে সত্যি খুব বিস্ময়কর মনে হয়। আর সব ধরনের প্রিজমই কিন্তু টেলিস্কোপ নয়,' বলে চললাম আমি। 'আমার কাছে অনেক পুরানো একজোড়া স্টোরিও প্রিজম বিনকিউলার আছে যা একমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষেই তৈরি করা সম্ভব। এ ছাড়াও আছে সপ্তদশ শতাব্দীর একটা লিপারশে।'

থেমে গেলাম আমি। মার্টিন ক্রেড শুনছে না আমার কথা। চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্রেড এ রকমই। আবেগহীন, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। লম্বা, রোগা, বাজপাখির মত মুখ ক্রেডের। চোখ দুটো দেখলেই ভয় লাগে। কেমন জানি অশুভ একটা আশঙ্কা খেলা করে ওর দুই চোখের তারায়। কারও দিকে তাকালে মনে হয় ভিতরের সবকিছু দেখে নিচ্ছে সে। ক্রেড অভদ্র প্রকৃতির লোক, জানি আমি। তাই ওর কাছে অতিথি হিসাবে তেমন কোনও সৌজন্যও আশা করি না।

গত বছর ক্রেড আমার বোন লুইজিকে বিয়ে করেছিল। সব সময় হাসিখুশি বোনটা আমার এই খা খা করা দেশটায় এসে কেমন মনমরা হয়ে পড়েছিল। শুরু থেকেই আমি এই বিয়ের বিপক্ষে ছিলাম। কিন্তু ক্রেডের প্রতি তার মোহকে একবিন্দু খর্ব করতে পারিনি। এই বাড়িতে আসার কিছুদিন পর, গত জানুয়ারিতে ক্রেড আমাকে চিঠিতে জানায় লুইজি অসুখে পড়ে হঠাৎ সবাইকে ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে।

লুইজির এই অকাল মৃত্যু প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছে আমায়। আগস্টের শেষের দিকে ক্রেড চিঠি লিখে জানতে চাইল আমি আবার তার ওখানে যাব কিনা তার মৃতা স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে। রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু লন্ডন থেকে যাত্রা করার পর থেকেই কেমন

খচখচ করতে লাগল মন। মনে হলো কোনও আতঙ্কের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি আমি। আগেও বার দুই এখানে এসেছি, কিন্তু এবার জায়গাটার চারদিকের বিস্তীর্ণ পতিত জমি একেবারেই হতাশ করে তুলল আমাকে।

রাতের খাবার পর ক্রেড দোতলায় আমার ঘর দেখিয়ে দিল।

'আমার বলতে খারাপ লাগছে, ব্রকটন,' বলল সে। 'কিন্তু তোমাকে বোধ হয় একাই সময় কাটাতে হবে। জানোই তো আমি একটু একাকিত্ব পছন্দ করি। আর মেহমানদারিতেও খুব একটা পটু নই। তবুও কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে জানাতে কুণ্ঠিত হয়ো না।'

বাড়িটার মতই আমার ঘরটাও কালো, ভারি আসবাবপত্রে বোঝাই। বদখত চেহারার জিনিসগুলো আমার কাছে ভাল ঠেকল না মোটেও। দক্ষিণ দিকে দুটো ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, খোলা। ছোট্ট একটা ব্যালকনি চোখে পড়ল। ব্যালকনিটা দেখে তবু যা হোক একটু স্বস্তি পেলাম। টেলিস্কোপটা নিয়ে পা বাড়ালাম ওদিকে। চোখে টিউব লাগিয়ে ফোকাস করলাম।

এখনও সন্ধ্যা নামেনি। দূরে, দিগন্তের সাথে মিশে আছে ঘনগুল্মের ঝোপ। বাতাসে দোল খাচ্ছে ওগুলোর মাথা, যেন ঢেউ উঠল নদীতে। আমি অনেকক্ষণ বাড়িটার বাঁ থেকে ডানে টেলিস্কোপটা ঘোরালাম। মনে হলো যন্ত্রটার মধ্যে কোথাও একটা গোলমাল আছে। চোখ থেকে নামালাম ওটা। ৩ মিলিমিটার ব্যাসার্ধের অ্যাক্রোমেটিক এই জিনিসটা বেশ শক্তিশালী এবং পরিষ্কার, কিন্তু রেঞ্জের মধ্যে বারবার সাদাটে একটা দাগ চোখে পড়ছে কেন? গ্লাসটা মুছে আবার চোখে লাগালাম আমি, পশ্চিম থেকে দক্ষিণের দিকে ঘোরাতে শুরু করলাম যন্ত্রটাকে। এদিকটাতে শুধুই ধু ধু মরুভূমি, কিন্তু পুবে তাকাতেই বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলাম। লম্বা, ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা বিল্ডিং-এর সামনে সাদা কুয়াশার বিশাল একটা দেয়াল ঝুলে আছে। কিন্তু আমার

স্পষ্ট মনে আছে গ্রামে ঢোকার সময় ওদিকটাতে এমন কিছু নজরে পড়েনি। এ রকম কোনও বিল্ডিংও যে এ গ্রামে নেই সে ব্যাপারেও আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। মিনিট পনেরো পর ক্রেডের ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনলাম, নীচে নামছে ও। আমিও লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকলাম। একটু আগের ঘটনাটা ওকে বলতে সে ব্যাপারটার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারল না।

'পুবে, ব্রকটন? উঁহু, তুমি নিশ্চয়ই ভুল করেছ। এদিকে বাড়ি বলতে শুধু আমারটাই আছে। আর সবচে' কাছের কোনও বিল্ডিংও শ্লোভারে। সুতরাং এমন কিছু তোমার চোখে পড়তেই পারে না।'

'ওদিকে কোনও চুনা পাহাড় কিংবা রোমানদের ধ্বংসাবশেষ নেই?' জানতে চাইলাম আমি। ক্রেড কৌতুকের দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ করতে করতে মাথা নাড়ল দুদিকে। 'না, নেই।'

পরদিন সকালে আমি আবার টেলিস্কোপে চোখ রাখলাম। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, তামাটে হয়ে আছে আকাশ। কিন্তু এর মধ্যেও আমি স্পষ্ট আগের দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। গভীরভাবে লক্ষ করতে মনে হলো রঙটা একটু বদলেছে। দেয়ালটা সাদা থেকে হালকা গোলাপী রঙ ধারণ করেছে। আর ওটা যেন সামান্য একটু সামনের দিকেও এগিয়ে এসেছে। দেয়ালটাকে লক্ষ করতে গিয়ে মনে হলো ওটা যেন আস্তে আস্তে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটায় বেশিক্ষণ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না। সরে এলাম ওখান থেকে। জামাকাপড় পরে চলে গেলাম নীচে, ডাইনিং রুমে।

আজ ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো, আসলে কেন ক্রেড আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছে। বিয়ের আগেই লুইজি হারউইচের কাছে বিশাল এক সম্পত্তির মালিকানা পেয়ে গিয়েছিল। অর্থমূল্যে সেই সম্পত্তির দাম এখন বেড়েছে কয়েকগুণ, কিন্তু অন্যান্য সম্পত্তির মতই ওটাতেও আমার যৌথ নাম রয়েছে। ক্রেড জানতে চাইল

আমি আমার অংশের দাবি ছাড়তে রাজি কিনা। ক্রেডের বলার ভঙ্গি পছন্দ হলো না। সম্পত্তিটার প্রতি যে তার লোভ প্রচুর, ওর কথা শুনেই বুঝে ফেললাম সেটা। আমি ভ্রূ কুঁচকে ক্রেডের বাজপাখির মত মুখের দিকে তাকালাম। অপেক্ষা করছে ক্রেড আমার জবাবের জন্য। আমিই লুইজিকে সম্পত্তিটা কেনার ব্যাপারে প্রভাবিত করেছিলাম, কিন্তু এখন আমার নেতিবাচক একটা জবাব দিতে ইচ্ছে করল। পরক্ষণে ভাবলাম কী লাভ এতে। স্বামী হিসাবে এই লোকটারও তো তার স্ত্রীর সম্পত্তির হক আছে। আর তার সেই অধিকার বরং আমার চেয়ে বেশি। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রেডকে জানালাম, আমি রাজি।

সন্তুষ্ট হাসি ফুটে উঠল ক্রেডের ঠোঁটে। 'আমি আগেই ধারণা করেছিলাম তুমি অমত দেবে না,' বলল সে। 'কাল আমরা গ্রামে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে দস্তখতের ব্যাপারটা সেরে ফেলব, কী বলো?'

আর কোনও কথা না বলে উঠে পড়ল ক্রেড, ভারি একটা রেইনকোট চাপিয়ে বেরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে ওকে লক্ষ করলাম আমি। বৃষ্টিতে ভিজে আস্তে আস্তে পুবে, শ্লোভারের দিকে এগোচ্ছে সে।

বাড়িতে এখন একা আমি। দোতলায়, আমার ঘরে চললাম। দরজার ছিটকিনিতে হাত রেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ক্রেডকে এখনও বলা হয়নি এখানে আমার আসার উদ্দেশ্য লুইজির কিছু জিনিস নিয়ে যাওয়া। এর মধ্যে একটি বিশেষ জিনিস হচ্ছে একটা মূল্যবান আঙটি, সবুজ পাথরে ওতে অঙ্কিত আছে লুইজির নামের প্রথম ইংরেজি অক্ষর 'এল'। ওটা আমিই লুইজিকে উপহার দিয়েছিলাম। সবসময় সে আঙটিটা আঙুলে পরে থাকত। বোনের স্মৃতি রক্ষার্থে এই আঙটিটা আমার বিশেষ প্রয়োজন। ক্রেডের কাছে চাইলে ও দেবে কিনা জানি না। তাই নিজেই ওটা খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

করিডর ধরে এগিয়ে চললাম আমি। দাঁড়ালাম লুইজির ঘরের দরজার সামনে। দরজায় ডাবল তালা। ফ্রেমের গায়ে একটা শেকল জড়ানো, ওটা বাঁধা রয়েছে ভারি একটা তালার সঙ্গে। পুরো এক মিনিট আমি বিস্মিত চোখে তালাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর ফিরে গেলাম নিজের ঘরে। চেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবার চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা কী?

ব্যাপারটা এভাবে সাজানো যায়–ক্রেড তার স্ত্রীর মৃত্যুতে এতই শোকাহত হয়ে পড়েছিল যে চিরদিনের জন্য লুইজির ঘর বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু লুইজির শেষের দিকের চিঠিগুলোর কথা মনে পড়ল আমার। তাতে ওর প্রতি ক্রেডের কোনও ভালবাসার কথা লেখা থাকত না। প্রতিটি চিঠিতেই লুইজি লিখত ক্রেড তার সঙ্গে অসম্ভব খারাপ ব্যবহার করে তার জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি আমার ভিতর জেগে উঠল। টেলিস্কোপটা তুলে নিলাম টেবিল থেকে, যদি অন্যদিকে মনটাকে ফেরানো যায় সেই আশায়। ছোট্ট ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। তাকালাম পূর্ব দিকে। দেয়ালটা এখনও আগের জায়গাতেই আছে, কিন্তু মনে হলো ওটার আকৃতি আগের চেয়ে দশগুণ বেড়ে গেছে। ভাল করে লক্ষ করতে আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। দেয়ালটা সম্পূর্ণ দুটো অংশে ভাগ হয়ে গেছে। একটার উপর আরেকটা, আনুভূমিকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। দুটো জিনিসের সঙ্গেই একটা নিকট সাদৃশ্য লক্ষ করলাম। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ও দুটোকে আমার একজোড়া হাত বলে মনে হলো। টেলিস্কোপটা দ্রুত অন্যদিকে ঘোরাতেই আরেকটি দৃশ্য চোখে পড়ল। খাঁ খাঁ প্রান্তর ধরে হেঁটে আসছে মার্টিন ক্রেড। বাতাসের ধাক্কা থেকে বাঁচার জন্য কুঁজো হয়ে আছে, সোজা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে দেয়াল দুটোর দিকে।

হঠাৎ আমার শরীরের নার্ভগুলো যেন একটা ঝাঁকি খেল।

দেয়াল থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়েছে ক্রেড, পেছন ফিরে চাইল। তারপর আবার পা বাড়াল সামনে, যেন ওখানে কিছুই নেই। দেয়াল দুটো তার পথে কোনও বাধার সৃষ্টি করল না। যেন ছায়ার মধ্যে ঢুকে গেল একজন মানুষ, ক্রেড সেভাবেই পার হয়ে গেল দেয়াল।

আমি ফোকাসটা ভগ্নাংশ পরিমাণ সরালাম। দেয়াল দুটো বড় হয়েই চলেছে। এত স্পষ্ট হয়ে উঠল ওগুলো যে কেঁপে উঠলাম ভয়ে। ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। ভারসাম্য হারিয়ে আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম ব্যালকনি থেকে।

লম্বা, সরু একজোড়া মসৃণ হাত। নারীর হাত। শূন্যে ভেসে থাকল হাতজোড়া এক মুহূর্ত, তারপর বিশালকায় সরীসৃপের মত নড়ে উঠল। আঙুলগুলো বারবার খুলতে আর মুঠো হতে শুরু করল। নখগুলো চকচক করে উঠল মেঘের আড়ালে থেকে ভেসে ওঠা সূর্যের আলোয়।

অনেকক্ষণ একভাবে টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে বসে থাকলাম আমি। হাতগুলো আস্তে ধীরে নড়ছে, কিন্তু জায়গা ছেড়ে সামনে বাড়ল না। তারপর আবার ক্রেডকে দেখলাম আমি। মরুভূমির দিক থেকে আসছে। ওকে দেখেই হয়তো হাত দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সারা সকাল আমি কাটালাম হাতজোড়াকে নিয়ে আগডুম বাগডুম ভেবে। ভয়ও লাগছে প্রচণ্ড। এসব কী দেখলাম আমি? ওই হাতজোড়া কীসের লক্ষণ? আমার নতুন টেলিস্কোপ কি অন্য কোনও জগৎকে দেখাল? এরকম রক্তমাংসের দানবীয় হাতের অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে থাকা কি সম্ভব? অপটিকস বিজ্ঞান কি হঠাৎই এমন জিনিস আবিষ্কার করে ফেলল যা দিয়ে ব্যাখ্যার দুঃসাধ্য দৃশ্য দেখা যায়?

টেলিস্কোপটা হাতে নিয়ে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম আমি। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল। যে প্যাকেটে গ্লাসটা

ঢোকানো ছিল ওটা কি আমি ফেলে দিয়েছি–না, আছে ওটা। পেস্টবোর্ডের বাক্সটা এখনও ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে আছে। কাঁপা হাতে তুলে নিলাম ওটাকে। বক্স-কাভারের ভিতরে আঠা লাগানো একটা ছোট কার্ড চোখে পড়ল। হিজিবিজি হাতের লেখা। কার্ডের উপরের অংশে টেলিস্কোপ টেকনিক্যাল বর্ণনা, কী ধরনের গ্লাস, গুণগত মান কী রকম ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শেষের অংশটা আমাকে বিমূঢ় করে তুলল:

...চালদারাবাদের হারানো শহর ইয়েজিদি নগরীর কাছে পূর্ব কুর্দিস্তান থেকে প্রাপ্ত বালি দিয়ে গ্লাসটি তৈরি করা হয়েছে। যদিও এই বালি গুণগত মানে সেরা, কিন্তু এগুলো দিয়ে স্কোপটি তৈরি করে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি।

ইয়েজিদিরা হচ্ছে এশিয়ার প্রেত-পূজারি, আর এই বালি সংগ্রহ করা হয়েছে তাদেরই মন্দিরের কাছের এক জায়গা থেকে। আমি জানি না, কিন্তু তারপরও সন্দেহ হচ্ছে কাজটা বোধহয় ঠিক হয়নি। মনে হচ্ছে, বালি সংগ্রহের ব্যাপারটা এই গ্লাসকে কেন্দ্র করে কোনও ঘটনার জন্ম দিতে পারে।

লিসবন, ২৪ মে,

... হোসে সাগাল্টা

নীচ থেকে ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে এল। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। গ্লাসটাকে এক পাশে রেখে নীচে নেমে এলাম আমি। খাওয়া দাওয়ার পর ঘটনাটা খুলে বললাম আমি ক্রেডকে। তারপর হাতের কথা বললাম। মুখ সাদা হয়ে গেল ক্রেডের, বড় বড় হয়ে উঠল চোখ।

'হাত, ব্লকটন?' ভাঙা শোনাল ওর কণ্ঠ। 'তুমি নিশ্চিত ওগুলো হাত ছিল?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। আমার ভুল হয়নি। স্পষ্ট দেখেছি আমি ওগুলো হাত ছিল। উঠে দাঁড়াল ক্রেড। অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল ঘরের মধ্যে। হঠাৎ ঘুরল আমার দিকে।

'আমি তোমার গ্লাসটা একবার দেখতে চাই।'

'অবশ্যই,' বললাম আমি। 'ওটা আমার ঘরে আছে। কিন্তু দৃশ্যপটটা এক ঘণ্টা আগে অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

ভীত মনে হলো গোঁয়ার লোকটাকে। মাথার চুল খামচে ধরল, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগল। তারপর ঘুরে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর অপসৃয়মান শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। একটা ভয় জেগে উঠল আমার মধ্যেও। তাড়াতাড়ি এগোলাম লাইব্রেরি ঘরের দিকে। বিশাল ঘরটার ছায়াছায়া অন্ধকার আর নীরবতায় কেমন ছমছম করে উঠল গা। বুক শেলফগুলোর দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকাতে লাগলাম। বইগুলোর প্রতি কোনও আগ্রহ অনুভব করছি না, মনে হচ্ছে লাইব্রেরির ছাদটা যেন ক্রমশ নেমে আসছে আমার দিকে, চেপে ধরতে চাইছে। চেয়ার টেবিলগুলোকে ধূসর আলোয় ভৌতিক ঠেকল।

নীচের দিকের শেলফ থেকে অন্যমনস্ক ভাবে একটা বই টেনে নিলাম আমি। বইটা চামড়ায় মোড়ানো, ক্রেডের হাতের লেখায় বোঝাই। তাড়াতাড়ি ওটা আগের জায়গায় রাখতে গিয়ে বইটার প্রচ্ছদ খুলে গেল, নজর কেড়ে নিল পেন্সিলে লেখা কয়েকটা লাইন।

'—সোমবার, ডিসেম্বর ৬। আমি জানি ও এখনও আমাকে কোনও রকম সন্দেহ করেনি। অবশ্য সেই সুযোগও আমি ওকে দেইনি। তরুণ ব্লে স্টুয়ার্ট যেদিন আমাদের বাড়িতে এল সেদিনই টের পেলাম ও প্রেমে পড়েছে ছোকরার। গভীর পরকীয়া প্রেম চলছে দুজনের মধ্যে। স্টুয়ার্ট বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু একটা গাধা। আমি নজর রাখছি ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তার ওপর।'

বার দুই লেখাটা পড়লাম আমি। কৌতূহল, সেই সঙ্গে একটা সন্দেহ জাগল মনে। নিজেকে সামলাতে না পেরে পরের

লেখাগুলোও পড়ে চললাম।

'–১২ ডিসেম্বর। স্টুয়ার্ট আজ আবার আমাদের দাওয়াত করেছে। সে আমার রাইফেল নেয়ার কথা বলে আসলেও আমি ভাল করেই জানি ওটা একটা অজুহাত। যে মুহূর্তে আমি ঘর থেকে বেরিয়েছি, আমি নিশ্চিত, লুইজি ছোকরার কোলে গিয়ে সেঁধিয়েছে; ওদের প্রেম আমার কল্পনার চেয়েও দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে আমি টের পেয়েছি লুইজিকে সেটা বুঝতেই দিইনি। ও এখনও আমার হাতের মুঠোয় আছে।

১৭ ডিসেম্বর। স্টুয়ার্ট আজ সকালে লন্ডন গেল। দেখা যাক এটা লুইজির ওপর কেমন প্রভাব ফেলে। আমি খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখব...।'

টের পেলাম ঠাণ্ডা ঘাম ফুটে উঠেছে আমার কপালে। আমি দ্রুত পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগলাম।

'–২৪ ডিসেম্বর। ভোলেনি সে ওকে। সারাদিন সে নিজের ঘরে বসে থাকে। রাতের পর রাত শুধু চিঠি লেখে। ছোকরাকে চিঠি লিখছে।

২৭ ডিসেম্বর। লুইজি আমার সঙ্গে এখন কথাই বলে না বলতে গেলে। ওর একটা চিঠি আজ লুকিয়ে পড়লাম। ছোকরার সঙ্গে ভেগে যাওয়ার তাল করেছে ও। ঠিক আছে, আমিও প্রস্তুত। আমিও ওকে ছাড়ব না। আমি ওকে খুন করবই।'

আর কিছু লেখা নেই। যন্ত্রচালিতের মত বইটা বন্ধ করলাম আমি। রেখে দিলাম আগের জায়গায়। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ যেন বিস্ফোরণের মত বাজতে লাগল কানে। এক সময় যেন চেতনা ফিরল আমার। ধীর পায়ে এগিয়ে চললাম নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকে আড়ষ্টভাবে বসে থাকলাম চেয়ারে, ঠায় তাকিয়ে রইলাম টেবিলের উপর টেলিস্কোপটার দিকে। জানি না কেন ওটা তুলে নিলাম হাতে, আচ্ছন্নের মত হেঁটে গেলাম ব্যালকনির দিকে।

হাত দুটো আগের জায়গাতেই আছে, দুলছে বাতাসে। অনেকক্ষণ হাতজোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। আঙুলের গোলাপী ত্বক পর্যন্ত এবার স্পষ্ট ধরা পড়ল চোখে। শরীরহীন অঙ্গগুলোর মধ্যে ভয়াবহ একটা ব্যাপার আছে যা ধরতে পারছি না আমি। হঠাৎ ওগুলো ধীরে, কাছে আসতে শুরু করল। পুরো গ্লাস জুড়ে এখন আমি ওদের দেখতে পাচ্ছি। আমার শরীরের কোথাও যেন অনুভূতি নেই, শুধু টের পেলাম হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে বুকে। হাত দুটো ক্রমশ আরও এগিয়ে এল। পেছনের জঙ্গল মুছে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, যেন সম্মোহন করা হয়েছে আমাকে; পলকহীন চোখে তাকিয়েই রইলাম।

হঠাৎ আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। প্রবল একটা আন্দোলন লক্ষ করলাম হাত দুটোতে। আঙুলগুলো আঁকশির মত বাঁকা হয়ে গেছে, মুঠো করছে, খুলছে। যেন টের পেয়ে গেছে ওদের সীমানায় কারও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সুযোগ পেলেই হামলা চালাবে তার উপর।

অকস্মাৎ একটা ঝাঁকি খেল কব্জি দুটো, আঙুলগুলো লাফিয়ে পড়ল সামনে, বাঁকা হয়ে গেছে…থাবা মারল যেন…

একই সঙ্গে বাড়িটার দেয়ালে বাতাস চিরে প্রতিধ্বনি তুলল কার যেন মরণ আর্তনাদ। চিৎকার করছে মার্টিন ক্রেড। আবারও আর্তনাদটা শোনা গেল, করিডরের প্রতিটি কোণে ধাক্কা খেল ওর ভয়ঙ্কর গোঙানি।

টেলিস্কোপটা ফেলে দিলাম আমি। দরজা খুলে দৌড়ে গেলাম হলঘরে। ক্রেডের ঘরের দরজা খুললাম সশব্দে। নেই সে এখানে। আবারও দৌড়ালাম আমি। লুইজির ঘরের উদ্দেশে। এই ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভিতরে পা বাড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে জমে গেলাম দৃশ্যটা দেখে।

ঘরের মাঝখানে, একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ে আছে মার্টিন ক্রেড। ওর মাথাটা কে যেন প্রবল শক্তিতে মুচড়ে ধরে

আছে পেছন দিকে, চোখ দুটো বিস্ফারিত। তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। হাতজোড়া অসহায় ভাবে ঝুলছে শরীরের দুই পাশে। দেখেই বুঝলাম মারা গেছে মার্টিন ক্রেড।

শরীরের কোথাও কোনও ক্ষত চোখে পড়ল না। অস্ত্র কিংবা কোনও ব্যক্তিকে দেখলাম না। সমস্ত ঘরে চোখ বুলিয়ে আতঙ্ক গ্রাস করল আমাকে। কাঁপতে কাঁপতে এগোলাম সামনের দিকে।

কাছে আসতেই ব্যাপারটা চোখে পড়ল আমার। ক্রেডের গলায় বৃত্তাকার একটা দাগ। দাগটা আঙুলের। কে যেন গভীর আক্রোশে ওকে গলা টিপে হত্যা করেছে। ভাল করে লক্ষ করতেই বুঝতে পারলাম দাগটা কোনও মহিলার আঙুলের। তবে দাগটায় অনামিকার ছাপ গাঢ় ভাবে ফুটে উঠেছে, গলার ওই জায়গাটার ত্বক বিবর্ণ হয়ে গেছে। ছাপটার দিকে ভাল করে তাকাতেই অজান্তে আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল, বেরিয়ে এল চিৎকার।

ছাপটা লুইজির আংটির, গোল এবং সমতল, স্পষ্ট ফুটে উঠেছে ইংরেজি অক্ষর 'এল'।

মূল গল্পঃ কার্ল জ্যাকবির 'দ্য হ্যান্ড'

শিকার

কী জঘন্য রাস্তা! আর কী বিশ্রী বৃষ্টি! আর মূর্খের মত অসম্ভব এই অ্যাসাইনমেন্টে বেরিয়ে পড়া।

জন শেলিংগার বাস্পাচ্ছাদিত উইন্ডস্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে মনে মনে গাল দিল। একটা ওয়াইপার একঘেয়েভাবে বৃষ্টির ফোঁটা মুছে চলেছে। কিন্তু উইন্ডস্ক্রীন তাতে অর্ধেকও পরিষ্কার হচ্ছে না। শেলিংগার আধ-পরিষ্কার তেকোনা কাঁচ দিয়ে তাকিয়ে কান্ট্রি রোডটার হদিশ পাবার চেষ্টা করল। হয়তো অনেক আগেই সে ও রাস্তা পার হয়ে এসেছে। ঢুকে পড়েছে কোন পার্শ্ববর্তী রাস্তায়, চলছে বিরানভূমির দিকে। তবে এমন ভুল নাও হতে পারে।

অ্যাসাইনমেন্টের কী ছিরি!

'ভ্যাম্পায়ার শিকারের এ ব্যাপারটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করবে।' র‍্যান্ডালের আদেশ। 'অন্যান্য নিউজ সার্ভিসগুলো মধ্যযুগের কুসংস্কারকে সঙ্গী করে মন গড়া গল্প ফাঁদবে। কিন্তু তুমি ও লাইন থেকে দূরে থাকবে। তিন হাজার শব্দের মধ্যে আমি এমন লেখা চাই যা পড়ে চোখে জল চলে আসবে পাঠকের।'

আর তারপর আমাকে এই লঝঝরে কনভার্টিবলের কাঁধে চেপে বেরিয়ে পড়তে হলো, তেতো মন নিয়ে ভাবল শেলিংগার। এমন একটা জায়গায় এসেছি যেখানকার বাসিন্দারা অচেনা কাউকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে ফেলে, কথা বলতে চায় না। কারণ সম্প্রতি এ এলাকা থেকে তিনটে বাচ্চা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভ্যাম্পায়ার নাকি ধরে নিয়ে গেছে ওদেরকে। বাচ্চাগুলো বেঁচে

আছে কিনা সেটুকু তথ্য পর্যন্ত কেউ দিল না। অথচ র‍্যান্ডাল তার লেখা পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে। আমি খামোকা এ জন মানবশূন্য এলাকায় ঘুরে মরছি। এই বৃষ্টির মধ্যে সবাই ভ্যাম্পায়ার শিকারে বেরিয়ে পড়ল নাকি!

রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। আর প্রবল বৃষ্টির জন্য দূরের কিছু দেখাও যায় না। রুমাল দিয়ে কাঁচ মুছতে মুছতে শেলিংগার ভাবল ওর গাড়ির আরেক জোড়া হেডলাইট থাকলে মন্দ হত না। সে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

সামনে অন্ধকার রাস্তা। হয়তো এটা ভ্যাম্পায়ারদের এলাকা। ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে। হঠাৎ হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়বে গাড়ির উপর।

ব্রেক কষল শেলিংগার। না ভ্যাম্পায়ার হামলা চালায়নি। ছোট একটি মেয়ে। কালো চুল, নীল জিন্স। দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে। ভিজে চুপচুপে। জানালার কাঁচ নামিয়ে ঝুম বৃষ্টির মধ্যে মাথা বের করল শেলিংগার।

'অ্যাই মেয়ে। গাড়িতে আসবে?'

মেয়েটির পেছনে আঁধারে ঢাকা গ্রাম। বিষণ্ন থমথমে। তার চোখ গাড়ি ঘুরে স্থির হলো শেলিংগারের মুখে। ভাবছে। বাচ্চাটা হয়তো কোনদিন ক্রোমিয়াম প্লেটের, প্রাগৈতিহাসিক যুগের এ বাহন দেখেনি। এতে চড়ার কথাও হয়তো কল্পনা করেনি কখনও। বন্ধুদের সাথে গল্প করতে পারবে সে এ গাড়ি নিয়ে।

মা যে ধরনের অচেনা লোক থেকে তাকে সাবধান করে দিয়েছিল এর সাথে তাদের মেলে না এবং কাদা ও বৃষ্টির মধ্যে হাঁটার চেয়ে গাড়িতে বসে যাওয়া আরামের হবে ভেবেই হয়তো মেয়েটি সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। খুব ধীর গতিতে সে চলে এল সামনে, বসল শেলিংগারের ডান পাশে। 'ধন্যবাদ, মিস্টার,' বলল মেয়েটি।

শেলিংগার গাড়ি আবার স্টার্ট দিল, দ্রুত, এক ঝলক দেখে

নিল পাশের জনকে। ওর জিন্সটা ছেঁড়া, ভিজে লেপ্টে আছে গায়ে। নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লাগছে মেয়েটির। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। পাহাড়ি লোকদেরকে চেনে শেলিংগার। কষ্ট সহ্য করার আশ্চর্য ক্ষমতা এদের। নিজের শারীরিক কষ্ট বা অসুবিধে নিয়ে কখনও অভিযোগ করে না।

তবে মেয়েটি কোন কারণে ভীত। কুঁজো হয়ে আছে, কোলের উপর জড়ো করা হাত, দরজা ঘেঁষে বসেছে। কী নিয়ে ভয় পাচ্ছে ও? নিশ্চয়ই ভ্যাম্পায়ার!

'কোথায় যাবে তুমি?' নরম গলায় জানতে চাইল শেলিংগার।

'প্রায় মাইল দেড়েক দূরে। তবে ওদিকটাতে।' মোটাসোটা বুড়ো আঙুল তুলে কাঁধের পেছনে ইঙ্গিত করল মেয়েটি। ওর গড়ন দোহারা, এদিককার চিকনা বাচ্চাদের চেয়ে মাংসল শরীর, হয়তো বড় হয়ে সুন্দরীও হবে। তবে অশিক্ষিত বাপ-মা আগেই ধরে বেঁধে বিয়ে না দিলেই হলো।

বিরক্ত হলেও কুশলী হাতে গাড়ি ঘোরাল শেলিংগার, চলল ফিরতি পথে। ভ্যাম্পায়ার শিকারীদের সাথে আজ হয়তো আর দেখা হবে না, তাই বলে ছোট একটি মেয়েকে রাস্তার মধ্যে অসহায়ভাবে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। ওকে আগে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া দরকার। তা ছাড়া মুখ-চাপা স্বভাবের কৃষকগুলোর কাছ থেকে কোন তথ্য সে পাবে বলেও মনে হচ্ছে না।

'তোমরা কী ধরনের ফসল ফলাও–তামাক নাকি সুতা?'

'ওরা এখনও কিছু ফলায়নি। আমরা নতুন এসেছি এদিকে।'

'অ,' এজন্যই মেয়েটির কথায় পাহাড়ি টান নেই। এখানকার বাচ্চাদের চেয়ে একে একটু আলাদা এবং অভিজাত লাগছে। 'রাতের বেলা বেরুলে যে? এখানে ভ্যাম্পায়ার ঘুরে বেড়ায় শোনোনি? ভয় লাগে না তোমার?'

শিউরে উঠল মেয়েটি। 'শু-শুনেছি। তবে আমি সাবধান আছি।' অবশেষে বলল সে।

এ মেয়েকে নিয়েই তো গল্প লেখা যায়, ভাবছে শেলিংগার। এর মধ্যে মানবিক দৃষ্টিকোণ রয়েছে। আর এ জিনিসই র‍্যান্ডাল চাইছে। ভীরু, ছোট একটি মেয়ে, কৌতূহলের কাছে ভয়কে দমন করে রাতের বেলা বেরিয়ে পড়েছে। কীভাবে ব্যাপারটা শুরু করবে মাথায় নেই শেলিংগারের, তবে তার সাংবাদিক নাক চুলবুল করে উঠল।

'তুমি জানো ভ্যাম্পায়ার কী জিনিস?'

শেলিংগারের দিকে তাকাল মেয়েটি। বিস্মিত চাউনি। তারপর চোখ নামিয়ে ফেলল। মুঠো করা হাতের দিকে দৃষ্টি রেখে শব্দ খুঁজছে। 'এটা–এটা হলো এমন কেউ যার খাবারের বদলে মানুষের দরকার হয়।' দ্বিধাগ্রস্ত বিরতি। 'তাই না?'

'আ–হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল শেলিংগার। 'ভ্যাম্পায়াররা অমর হয়–মানে তাদের মৃত্যু নেই–জ্যান্ত মানুষের রক্ত খেয়ে অনন্তকাল তারা বেঁচে থাকতে পারে। ভ্যাম্পায়ারকে তুমি শুধু হত্যা করতে পারবে–'

'এদিকে গাড়ি ঘোরান, মিস্টার।'

একটা সাইড রোড থেকে বেরিয়ে আসা শাখার দিকে গাড়ি ঘোরাল শেলিংগার। শাখা রাস্তাটি অত্যন্ত সরু, গাছের ভেজা ডাল বাড়ি মারল উইন্ডস্ক্রীনে, পাতা অলসভঙ্গিতে ছুঁয়ে গেল সামনের কাঠামো। মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল গাছ ফোয়ারার মত জল ছিটিয়ে।

শেলিংগার উইন্ডস্ক্রীনে মুখ চেপে ধরল, ঝোপ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে সামনেটা দেখার চেষ্টা করছে। 'কী জঘন্য রাস্তা! সত্যি তোমরা কী করে যে থাকো এদিকে! যাক, যা বলছিলাম, ভ্যাম্পায়ার হত্যা করার একমাত্র উপায় হলো সিলভার বুলেট। অথবা সরাসরি বুকের মধ্যে গোঁজ ঢুকিয়ে মারতে পারো। তারপর মাঝ রাতে চৌমাথায় ওটাকে কবর দিতে হবে। আজ রাতে

ভ্যাম্পায়ার ধরতে পারলে ওরা তাই করবে।' মেয়েটিকে অস্ফূট আর্তনাদ করতে শুনে তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শেলিংগার। 'ভয় পেলে?'

'না। কিন্তু ব্যাপারটা বড্ড নিষ্ঠুর,' বলল মেয়েটি।

'কেন, তুমি কি ভ্যাম্পায়ারকে দয়া দেখানোর পক্ষে?'

একটু ভাবল মেয়েটি, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। 'হ্যাঁ। আমি দয়া দেখানোর পক্ষে। তা ছাড়া–' সঠিক শব্দ খুঁজতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল সে। 'তা ছাড়া কিছু মানুষ আছে তারা তাদের জন্মের জন্যে দায়ী নয়। মানে,' ধীরে, ভেবেচিন্তে বলে চলল, 'ধরুন, একজন ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেল। তা হলে তার দোষ কী?'

'তুমি ঠিকই বলেছ, খুকি,' শেলিংগারের চোখ রাস্তায়। 'তবে সমস্যা হলোঃ তুমি ভ্যাম্পায়ারে বিশ্বাস করলে ধরে নেবে তারা খুব খারাপ বলবে না যে তারা ভাল। গ্রামে যে তিনটে বাচ্চা নিখোঁজ হয়েছে, গ্রামবাসীদের ধারণা ওদেরকে ভ্যাম্পায়ার ধরে নিয়ে গেছে। তাদের কাছে নিশ্চয়ই ব্যাপারটি ভাল লাগেনি। তাই তারা ভ্যাম্পায়ার ধ্বংস করতে চাইছে। ভ্যাম্পায়ার জাতীয় যদি কিছু থেকে থাকে, লক্ষ করো, আমি "যদি" শব্দটি ব্যবহার করেছি, সেক্ষেত্রে তারা যে সব বীভৎস কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে তখন তাদেরকে হত্যা করা ছাড়া উপায় থাকে না। বুঝতে পেরেছ?'

'না। আপনি মানুষের বুকে গোঁজ ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করতে পারেন না।'

হেসে উঠল শেলিংগার। 'আমি বলব করা উচিত নয়। অন্তত আমি নিজে কখনও এ কাজ করব না। তবে ঘটনা যদি ঘটে ভ্যাম্পায়ারকে নিয়ে, আমাকে যদি ভ্যাম্পায়ার মারতে আসে, আমি আত্মরক্ষার খাতিরে অবশ্যই তার বুকে গোঁজ ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব।'

চুপ হয়ে গেল শেলিংগার। ভাবছে মেয়েটি বয়সের তুলনায়

বেশি পেকে গেছে। কুসংস্কার এখনও গ্রাস করতে পারেনি এ মেয়েকে। তবে ওর ব্যক্তিত্ব মুগ্ধ করেছে শেলিংগারকে। শেলিংগারের সাথে সে আরেকটু সহজ হয়েছে, বসেছে কাছ ঘেঁষে। শেলিংগারের অবাক লাগছে এ মেয়ে তাকে চেনে না অথচ কত স্বছন্দে তার গাড়িতে উঠে বসল। এতটুকু বাচ্চা কী করে বুঝতে পারল আমি তার কোন ক্ষতি করব না। আসলে গাঁয়ের শিশুরা এরকমই হয়। সহজ-সরল। প্রকৃতির সাথে বেড়ে উঠে বলেই।

মেয়েটির মন জয় করতে পেরেছে শেলিংগার। সেই সাথে লেখার মত একটি গল্পও পেয়ে গেছে। তবে গল্পে মেয়েটিকে সে আরেকটু রোগা পাতলা কাঠামোতে হাজির করবে, কিছুটা ভীতু স্বভাবের হবে সে এবং উচ্চারণে থাকবে পাহাড়ি টান।

মেয়েটি শেলিংগারের আরও কাছ ঘেঁষে এল। বেচারী! ওর শরীরের উত্তাপে ঠাণ্ডার কবল থেকে বাঁচতে চাইছে। গাড়িতে হিটার নেই বলে দুঃখ লাগল শেলিংগারের।

রাস্তাটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল বড় বড় ঝোপ আর গাছগাছালির মাঝে। গাড়ি থামাল শেলিংগার।

'তুমি নিশ্চয়ই এখানে থাকো না? এই ভূতুড়ে জায়গায় মানুষ বাস করতে পারে না।'

চারদিক এখন নির্জন, গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল শেলিংগারের। 'আমি এখানেই থাকি, মিস্টার,' ওর কানের কাছে মুখ এনে উষ্ণ গলায় বলল মেয়েটি। 'ওই ছোট্ট বাড়িতে।'

'কোথায়?' উইন্ডস্ক্রীন রুমাল দিয়ে মুছল শেলিংগার, চোখ কুঁচকে তাকাল হেডলাইটের আলোর রেখার দিকে 'আমি তো কোন বাড়ি ঘর দেখছি না। কোথায় ওটা?'

'ওই হোথা।' মোটাসোটা একটা হাত উঠে এল, ইঙ্গিত করল অন্ধকারের দিকে। 'ওখানে।'

'কিছুই তো দেখছি না–' চোখের কোণ দিয়ে হাতটা দেখল

শেলিংগার। তালু ফুঁড়ে বেরিয়েছে মসৃণ, বাদামী লোম। চকিতে মনে পড়ে গেল কথাটা–ভ্যাম্পায়ারের হাতের তালুতে লোম গজায়। ওর হাতের তালু!

'আর দাঁতের আকার নিয়ে যেন কী শুনেছিলাম?' আঁতকে উঠল শেলিংগার। ঘাড় ঘোরাতে গেল মেয়েটির দাঁত দেখার জন্য। কিন্তু পারল না। কারণ তার আগেই তীক্ষ্ণ, ধারাল দাঁত কামড়ে ধরেছে তার কণ্ঠনালী।

মূল গল্পঃ উইলিয়াম টেনের 'দ্য হিউম্যান অ্যাঞ্জেল'

পিশাচের পাল্লায়

পুরানো, লঝঝরে স্কুল বাসটা একগাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে ছুটে চলেছে শাহবাগ হয়ে কাকরাইলের দিকে। বাচ্চাগুলো চেঁচামেচি করছে। উইলস লিটল ফ্লাওয়ারের ক্লাস ফোরের ছাত্র রাকিব আহসানের পেছনে বসেছে একটা মেয়ে। সে তখন থেকে একটা শব্দ অনর্গল আউড়ে চলেছে। শব্দটা হলো পিশাচ।

'মেয়েটা কী বলছে?' পাশে বসা লিটন রহমানকে জিজ্ঞেস করল রাকিব। 'পিশাচ কী?'

অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লিটন। 'তুমি শোনোনি ঢাকা শহরে পিশাচ এসেছে? কেন টিভির খবরে তো প্রায় প্রতিদিনই খবরটা বলা হচ্ছে। খবরের কাগজেও দেখোনি?

রাকিব নীচের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, 'আমাদের বাসায় টিভি নেই। রেডিও-ও নেই। আর আমার বাবা-মা খবরের কাগজ রাখেন না।'

'আশ্চর্য তো!'

'বাবা-মার ধারণা টিভি দেখলে বাচ্চারা খারাপ হয়ে যায়। টিভিতে তো খালি মারামারির ছবি দেখায়, তাই।'

'আমার বাবা-মা তোমার বাবা-মা'র উল্টো,' কোঁকড়ানো চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল লিটন। 'আমি টিভি দেখলেও কিছু বলেন না।'

দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল রাকিব। 'কিন্তু তুমি তো বললে না পিশাচ কী জিনিস।'

'পিশাচ খুব খারাপ জিনিস,' ব্যাখ্যা করল লিটন। 'নরখাদকদের মত। মানুষ ধরে ধরে খায়। জ্যান্ত মানুষ তো বটেই, পচা গলা লাশেও তাদের আপত্তি নেই।

'শুনেই গা ঘিনঘিন করছে,' নাক কোঁচকাল রাকিব। 'তুমি বাড়িয়ে বলছ না তো?'

'মোটেই বাড়িয়ে বলছি না,' জোর গলায় বলল লিটন। 'ঢাকায় কয়েকটা পিশাচ এসেছে। হপ্তা কয়েক আগে দুটো বাচ্চা নিখোঁজ হয়েছে। সবাই বলছে পিশাচ ধরে নিয়ে গেছে ওদেরকে। গতরাতে আজিমপুর গোরস্তানের একটা নতুন কবর খুঁড়ে লাশ তুলে নিয়েছে।'

'ওয়াক থু।' গাড়ির জানালা দিয়ে একগাদা থুথু ফেলল রাকিব। গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল লিটন। 'হ্যাঁ, সত্যি ঘটনা এটা। কফিনটা বাদামতলীর ঘাটে পাওয়া গেছে। টিভিতে বলেছে। তবে কফিনটা ছিল খালি।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রাকিব, ভয়ে বিস্ফারিত চোখ।

মৎস্য ভবনের সামনের রাস্তায় গতি কমল বাসের। লিটন বলল, 'সেগুনবাগিচায় আমাদের বাসা। যাবে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাকিব। 'যেতে পারলে ভালই লাগত। কিন্তু বাবা-মা যেতে দেবে না। স্কুল আর বাসা ছাড়া অন্য কোথাও যাবার অনুমতি নেই আমার।'

'ছুটির দিনে আসো,' ব্যাগ গোছাল লিটন। 'কাল তো ছুটি–'

'পারব নারে ভাই,' করুণ গলা রাকিবের। 'আমি বড় জোর রমনা পার্কে ঘুরতে আসতে পারি। তাও বাবার সঙ্গে।'

'তোমার কথা শুনে খারাপই লাগছে,' সহানুভূতির সুরে বলল লিটন। 'তা হলে তোমার ফোন নাম্বারটা অন্তত দিয়ো। ফোন করব'খন।'

'আমাদের ফোন নেই,' উদাস গলায় বলল রাকিব।

'ধ্যাত, তুমি মিথ্যা বলছ,' বলল লিটন। 'দ্যাখো তুমি যদি

আমার সাথে বন্ধুত্ব করতে না চাও তা হলে পরিষ্কার বলে ফেললেই পারো। এত বাহানার কী দরকার?'

'না, না। তুমি ভুল বুঝছ,' দ্রুত বলে উঠল রাকিব।

'আমি–'

ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে পড়েছে বাস, লিটন নেমে পড়ল চট করে। পেছনে তাকালও না।

রাকিব সিটে হেলান দিয়ে বসে রইল। ওর মন খারাপ হয়ে গেছে। ভাবছে ওর কপালটা এমন কেন? কেন ওকে পালক বাবা-মা'র সঙ্গে থাকতে হচ্ছে? সবার নিজেদের মা-বাবা আছে। ওর নেই কেন?

সেদিন রাতে রাকিবকে গম্ভীর মুখে খাবার খেতে দেখে ওর পালক মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার?'

রাকিবের পালক বাবারও চোখ এড়ায়নি ছেলের আচরণ। জানতে চাইলেন, 'স্কুলে কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

মুখ তুলে চাইল রাকিব। থমথমে গলায় বলল, 'স্কুলে সবাই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। আমাদের বাসায় ফোন নেই, টিভি নেই, রেডিও নেই। এমনকী খবরের কাগজ পর্যন্ত আমাদের বাসায় রাখা হয় না।'

ডানে-বামে মাথা নাড়লেন মা। 'এই নিয়ে মন খারাপ? বোকা ছেলে! টিভি-রেডিও বা ফোনের আমাদের প্রয়োজন হয় না বলে নেই।'

বাবা হাত রাখলেন রাকিবের কাঁধে। 'স্কুলের ছাত্ররা ঠাট্টা করলেও ওসব গায়ে মাখতে নেই। তোমার বয়সী ছেলের উচিত সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা। আর সবার মত হওয়া।'

'হ্যাঁ, বাবা,' বলল রাকিব। 'আমি আর সবার মতই হতে চাই। জানতে চাই আশপাশে কী ঘটছে। স্কুলের ছেলেরা কী এক পিশাচ নিয়ে আলোচনা করছে শুনলাম। অথচ এ ব্যাপারটা

সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

'না জানাই ভাল,' বললেন মা। 'আমরা চাই না এসব জিনিস তোমার মাথায় ঢুকুক।' হাসলেন তিনি। 'বিশেষ করে পিশাচ জাতীয় কিছু।'

'তুমি বলতে চাইছ এগুলো সত্যি নয়?' জিজ্ঞেস করল রাকিব।

'না সত্যি নয়,' বললেন ওর বাবা। 'এসব জিনিস নিয়ে ভেবে মাথা গরম না করাই ভাল। বাচ্চারা ভূত-প্রেত, পিশাচ নিয়ে গল্প বানাতে ভালবাসে। তোমাকেও ওরা সেরকম একটা গল্প শুনিয়ে দিয়েছে।'

বাবার কথা শুনে মনে হলো উনি ঠিকই বলেছেন। রাকিব কী বোকা, এসব গল্প শুনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। সে তার মা'র দিকে তাকাল। মা হেসে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, 'নাও। এখন দ্রুত খেয়ে বিছানায় যাও। জানো তো আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ–'

মা'র কথা শেষ করল রাকিব, 'মেকস এ ম্যান হেলদি, ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ। জানি আমি।' হাসল সে।

রাতের খাবার শেষে ঘণ্টাখানেক পড়াশোনা করল রাকিব। তারপর বাবার সঙ্গে দাবা খেলল। পরপর দু'বার জিতে খুশি হয়ে উঠল সে। আরও একবার খেলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু রাত দশটা বাজে। তাড়া দিলেন বাবা। ঘুমোবার সময় হয়ে গেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়ল রাকিব। ঢুকল নিজের ঘরে। শুয়ে শুয়ে লিটনের কথা ভাবল। ছেলেটা খামোকাই ওকে ভুল বুঝেছে। ওর বাবা-মা যদি এরকম হয় তাতে রাকিবের কী দোষ? ব্যাপারটা বোঝাতে হবে লিটনকে।

মাথার নীচে হাত রেখে, ছাদের দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবছিল রাকিব।

হঠাৎ শুরু হয়ে গেল শব্দগুলো।

প্রথমে বাবা-মা'র পায়ের শব্দ শুনল রাকিব। ওরা নিজেদের ঘরে যাচ্ছেন। তারপর শুরু হলো ঝিঁঝির কোরাস। একটু পরে মগবাজার রেলগেট থেকে ট্রেনের আওয়াজ ভেসে এল।

তবে এগুলো স্বাভাবিক শব্দ।

রাত সাড়ে দশটার দিকে অদ্ভুত, অস্বাভাবিক সব শব্দ হতে শুরু করে। পাশের বাড়ি থেকে শব্দ আসে। রাকিবদের এক ইউনিটের ফ্ল্যাটটা ভেঙে দুই ইউনিট করা হয়েছে। মাঝখানে একটা কাঠের পার্টিশন। পার্টিশনের ওপাশে কারা থাকে জানে না রাকিব। ওই ভাড়াটেদের চেহারা কখনও দেখেনি সে। তবে লোকগুলো বড় গোলমাল করে। বিশেষ করে ছুটির দিনে। ঠুসঠাস, দুমদাম লেগেই আছে। বাজে যন্ত্রসঙ্গীত। মনে হয় সারা রাত ধরে ওরা চেয়ার-টেবিল সরাচ্ছে, কোন কিছু টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বিছানার উপর হাঁটু গেড়ে বসল রাকিব, উঁকি দিল জানালা দিয়ে। এখান থেকে পাশের ফ্ল্যাটটা পরিষ্কার দেখা যায়। ও বাড়ির জানালার পর্দা ফেলা। তবে আলো জ্বলছে। পর্দার আড়ালে নড়াচড়া করছে কতগুলো ছায়ামূর্তি। একজনের হাতে একটা ছুরিও যেন দেখল রাকিব। নাকি এটা স্রেফ ওর কল্পনা?

হঠাৎ নিচু গলায়, খলখল করে হেসে উঠল এক ছায়ামূর্তি, দুড়ুম শব্দে কী যেন পড়ল মেঝের উপর। ভোঁতা একটা চিৎকার ভেসে এল, সেই সাথে হাসির আওয়াজ। 'ওই বাড়িতে এসব কী হচ্ছে?' বিড়বিড় করল রাকিব। হঠাৎ লিটনের বলা পিশাচের কথা মনে পড়ে গেল ওর। হয়তো রাকিবের বাবা-মা ভুল বলেছেন। সত্যি কথাটা জানেন না তাঁরা। হয়তো সত্যি পিশাচের অস্তিত্ব আছে। আর তারা বাস করছে পাশের বাড়িতেই!

কল্পনায় ভয়ঙ্কর সব পিশাচ দেখতে শুরু করল রাকিব। ভাঁটার মত চোখ, বড় বড় দাঁত, পচা লাশ ছিঁড়ে খাচ্ছে হাসতে হাসতে।

আবার খনখনে গলায় কে যেন হেসে উঠল পাশের বাড়িতে।

জোরাল হয়ে উঠল যন্ত্র সঙ্গীত। তারপর থেমে গেল হঠাৎ করেই। রাকিবের মনে হলো পর্দার আড়ালে, ভাঙা জানালা দিয়ে কেউ উঁকি দিল। তারপর টেনে দেওয়া হলো পর্দা। এক মুহূর্তের জন্য নেমে এল সুনসান নীরবতা। তারপর বাড়ির ভিতর থেকে আরেকটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল রাকিব। যেন ভারি কোন শরীর টেনে নামানো হচ্ছে চিলেকোঠা থেকে। সিঁড়ির সাথে বাড়ি খাচ্ছে শরীর, ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। একটু পরপর শব্দটা থেমে যাচ্ছে। আবার শুরু হচ্ছে। যেন ওজনদার শরীরটা টেনে নিয়ে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কেউ। বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করছে কাজ।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে রাকিবের। ধুপধাপ আওয়াজ শুরু হলো আবার। জানালার ধার থেকে সরে গেল আরেকটা ছায়ামূর্তি। তারপর দড়াম শব্দে কোথাও বন্ধ হয়ে গেল দরজা। পর মুহূর্তে ভৌতিক নীরবতা নেমে এল চারপাশে।

হঠাৎ রাকিবের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। লাফিয়ে উঠল ও।

'ভয় পেয়েছ, সোনা?' দরজা খুলে উঁকি দিলেন রাকিবের মা।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল রাকিব। শিউরে উঠল, 'ওই বাড়িতে আজ আবার সেই ভৌতিক শব্দগুলো শুরু হয়েছে।'

মা বললেন, 'আমরাও শুনেছি। শব্দ শুনে তোমার বাবারও ঘুম ভেঙে গেছে।'

'ছুটির দিনেই যত অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাই ও বাড়ি থেকে,' বলল রাকিব। 'আর ভৌতিক সব ঘটনা ঘটে। মাঝে মাঝে গাড়ি থামতে দেখি বাড়িটার সামনে। কিন্তু বাড়ির বাসিন্দাদের চেহারা কোনদিন দেখলাম না।'

'পড়শী রোজ এরকম বিরক্ত করলে পুলিশে খবর দিতেই হবে,' ভিতরে ঢুকলেন রাকিবের বাবা।

'বাবা,' ইতস্তত গলায় বলল রাকিব, 'ওখানে কি কোন পিশাচ থাকে? মানে যে ধরনের শব্দ শুনছি...'

'দুরো,' ছেলেকে থামিয়ে দিলেন বাবা। 'ওরা পিশাচ হতে

যাবে কেন? তুমি দেখছি এখনও পিশাচের গল্পটা ভুলতে পারোনি। নাও। ঘুমিয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়েছে।'

রাকিবকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন ওর মা। চুমু খেয়ে বললেন, 'গুড নাইট,' তারপর চলে গেলেন।

বাবা-মা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র জানালা দিয়ে আবার উঁকি দিল রাকিব। পাশের বাড়িতে কিছু একটা ঘটছে সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত। তবে দেখতে হবে ব্যাপারটা কী।

শনিবার স্কুলে লিটন কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলল রাকিবকে। শেষে, ক্লাস ছুটির পরে লিটনকে পাকড়াও করল রাকিব। ওকে বোঝাতে সমর্থ হলো ফোনের ব্যাপারে মিথ্যা বলেনি সে। রাকিবের কথা এবার বিশ্বাস করল লিটন। পরের দিন দেখা গেল ওরা ক্লাসে, পাশাপাশি বসেছে। দু'জনে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে বেশি সময় লাগল না। এক সঙ্গে লাঞ্চ টাইমে টিফিন খায় ওরা, বাসে চড়ে বাড়িতে ফেরে এক সাথে। বিষ্যুদবার রাকিব দাওয়াত করল লিটনকে ওর বাড়িতে যেতে।

'তোমার বাবা-মা যেহেতু আমাদের বাসায় তোমাকে আসতে দেবে না,' বলল লিটন সমঝদারের ভঙ্গিতে, 'কাজেই আমারই যাওয়া উচিত তোমাদের বাসায়।'

পরদিন শুক্রবার। স্কুল ছুটি। সকালে ফুরফুরে মন নিয়ে ঘুম থেকে জাগল রাকিব। বাবার একটা হোন্ডা আছে। প্রতি শুক্রবার ওটাকে ধোয়ামোছা করেন তিনি। হোন্ডা ধোয়ার কাজে বাবাকে খানিক সাহায্য করল রাকিব। তারপর মা'র সঙ্গে বাজারে গেল। সারাক্ষণই লিটনের কথা বলে বাবা-মা'র কান ঝালাপালা করে দিল সে। কিন্তু লিটন সেদিন এল না।

রাকিবের মা বললেন, 'তুমি ভুল ঠিকানা দিয়ে আসোনি তো?' রাকিব দৃঢ় গলায় বলল সে সঠিক ঠিকানাই দিয়েছে। রাকিবের বাবা বললেন, 'লিটন হয়তো এসেছিল। আমি তখন গ্যারেজে

ছিলাম। আর তোমরা ছিলে মার্কেটে। বাড়িতে কাউকে না দেখে চলে গেছে।'

লিটনের উপর রাগ হলো রাকিবের। এত আশা করেছিল লিটন আসবে! আশা ভঙ্গের বেদনায় রাকিব প্রতিজ্ঞা করল লিটনের সঙ্গে আর কথা বলবে না। আড়ি দেবে।

কিন্তু শনিবার স্কুলে এল না লিটন। স্কুলে গুজব ছড়িয়ে পড়ল পিশাচের খপ্পরে পড়েছে লিটন। তবে গুজবটাকে পাত্তা দিতে ইচ্ছে করল না রাকিবের। ভাবল গুজব গুজবই। কিন্তু পরদিন রাতে দুই পুলিশ অফিসারকে ওদের বাড়িতে আসতে দেখে ভয় পেয়ে গেল রাকিব।

'শুনেছি লিটন তোমার বন্ধু ছিল,' বলল মোটাসোটা এক পুলিশ অফিসার।

'জ্বী,' বলল রাকিব। 'ওর কী হয়েছে?'

'শুক্রবার দুপুর থেকে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না,' জানাল দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার। 'লিটনের মা বলেছেন সে দুপুরে তোমাদের বাসার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে।'

'আমাদের বাসায়?' হাঁ হয়ে গেল রাকিব। 'তার মানে–'

'তার মানে কী, খোকা?' প্রশ্ন করল প্রথম জন।

জবাবে কিছুই বলতে পারল না রাকিব। ওর মা ব্যাখ্যা করলেন সারাদিন রাকিব তার বন্ধুর অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু লিটন না আসায় সে সাংঘাতিক কাতর হয়ে পড়ে।

'ছেলেটাকে কেউ অপহরণ করেনি তো?' গম্ভীর মুখে জানতে চাইলেন রাকিবের বাবা।

'তেমন ঘটাও বিচিত্র নয়, মি. আহসান,' নোটবই বন্ধ করল মোটা পুলিশ অফিসার আনোয়ার উদ্দিন। 'তবে এখনও সে রকম কোন প্রমাণ আমরা পাইনি।' রাকিব কথা বলছে না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। তার কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করল আনোয়ার উদ্দিন, 'তুমি নিশ্চিত যে তোমার বন্ধু এখানে আসেনি?'

'না, আসেনি,' রাকিবের হয়ে জবাব দিলেন ওর বাবা। 'কারণ সারাদিন আমি বাসায় ছিলাম। পরশু আমাদের বাড়িতে কেউ আসে নি, অফিসার।' তিনি ভুরু কুঁচকে তাকালেন অফিসারদের দিকে। 'এ কোন দেশে বাস করছি বলুন তো? যেখানে বন্ধুর বাড়িতেও নিরাপদে বেড়াতে যেতে পারবে না কোন শিশু।'

পুলিশ অফিসাররা চলে যাবার সাথে সাথে নিজের ঘরে ঢুকল রাকিব। চোখে জল। ওর বাবা-মা এলেন ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে। রাকিব কিছু বলল না। চোখ বুজে শুয়ে রইল। ওর বাবা-মা ভাবলেন ঘুমিয়ে পড়েছে রাকিব। তারা রাকিবের গায়ে গরম কম্বল চাপিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। যাবার আগে ঘরের বাতি নেভাতে ভুললেন না। নীল ডিম লাইটের আলোয় রাকিব দেয়ালঘড়িতে দেখল রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। লিটনের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল রাকিব। এত শীতেও ঘেমে গেছে। কম্বলটা সরে গেছে গা থেকে। তাই শীতে কাঁপছে ও। দেয়ালঘড়ির দিকে চোখ চলে গেল রাকিবের। তিনটা বাজে।

বমি বমি লাগছে রাকিবের। খুব পেট ব্যথা করছে। সর্দিও লেগেছে মনে হচ্ছে। বন্ধ দরজার দিকে তাকাল রাকিব। ঘর থেকে বেরুবার অনুমতি নেই। কিন্তু বাবা-মাকে এক্ষুণি দরকার ওর। কারণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে ও।

'মা! বাবা!' দরজায় টোকা দিল রাকিব।

কোন সাড়া নেই। আবার টোকা দিল ও। সাড়া না পেয়ে নব ঘুরিয়ে খুলে ফেলল দরজা। উঁকি দিল। কেউ নেই ভিতরে। পেট ব্যথাটা বেড়েছে। সে দু'হাতে পেট চেপে ধরে অন্ধকার বাড়িতে খুঁজে বেড়াতে লাগল মা-বাবাকে। কোথাও দেখতে না পেয়ে আবার মা-বাবার বেডরুমে ফিরে এল রাকিব। চাঁদের আলোয় ঘরের অন্ধকার সামান্যই দূর হয়েছে। ভয় লাগছে রাকিবের।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে মনে হলো কোথাও কোন ভজকট হয়ে গেছে। হঠাৎ ব্যাপারটা চোখে পড়ল ওর। বুক-কেস। দেয়াল থেকে সামান্য সরে এসেছে কেসটা। ধরে টান দিতেই ঘুরে গেল বুক-কেস। ফাঁক হয়ে গেল দেয়াল। দেখা গেল দেয়ালের পাশে লম্বা এক প্রস্থ সিঁড়ি।

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল রাকিব। ভয়ের সাথে কৌতূহলও জাগছে বেশ। সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটা প্যাসেজওয়েতে ঢুকে পড়ল ও। ওটা হঠাৎ করেই ডানদিকে মোড় নিয়ে সামান্য খাড়া হয়ে উঠেছে, মিশেছে ভারি একটা দরজার সঙ্গে। নব ঘুরাতেই খুলে গেল দরজা। দরজার ওপাশে একটা রান্নাঘর। অন্ধকার। আবর্জনা ভর্তি। পচা, বিকট একটা গন্ধ বাতাসে।

রান্নাঘরের জানালায় পর্দা লাগানো। ধুলোমাখা পর্দা ধরে টান দিতেই দারুণ চমকে উঠল রাকিব। বড় বড় হয়ে উঠল চোখ, ঘাড়ের পেছনের খাটো চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে। ওদের বাড়িটাকে দেখতে পাচ্ছে রাকিব। তার মানে সে প্রতিবেশীদের বাড়িতে চলে এসেছে!

রাকিবের ইচ্ছে করল গলা ছেড়ে চিৎকার করে ওঠে। ঝেড়ে দৌড় দেয়। কিন্তু পেছনে, সিঁড়ি ঘর থেকে কার যেন অস্পষ্ট কণ্ঠ শুনতে পেয়ে জমে গেল ও। পাঁজরের গায়ে দিড়িম দিড়িম বাড়ি খেতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড, কণ্ঠটা ক্রমে কাছে আসছে। সেই সাথে পচা, বোটকা গন্ধটাও বেড়ে চলল। 'সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলতে হবে,' হিস হিস করে উঠল একটা পুরুষ কণ্ঠ।

'সে তো অবশ্যই,' খিকখিক হেসে উঠল একটা নারী কণ্ঠ।

রাকিবের আবার ইচ্ছে করল চিৎকার করে দৌড় দিতে। কিন্তু দৌড় দিলেই ওরা টের পেয়ে যাবে। সে নিঃশব্দে পৌঁছতে শুরু করল। হঠাৎ কীসে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাকিব। জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখল একটা জ্যাকেট। মনে পড়ে গেল এ

জ্যাকেটটাই সব সময় গায়ে দিত লিটন। ভয়ানক আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে যাচ্ছে রাকিব, পেছন থেকে একটা হাত চেপে ধরল মুখ।

'সব জায়গায় নাক গলাতে যাওয়া মোটেই ভাল কাজ নয়,' বলে উঠল পরিচিত একটা কণ্ঠ। ধীরে ধীরে ঘুরল রাকিব। ওর বাবা।

'তোমাকে নিষেধ করেছি না ঘর ছেড়ে বেরুবে না,' রাকিবকে ভর্ৎসনা করলেন ওর মা। বেরিয়ে এসেছেন বাবার আড়াল থেকে। 'তুমি আমাদের কথা শোনোনি।'

'তোমার জন্যে বিরাট ঝামেলায় পড়ে গেছি আমরা।' বললেন ওর বাবা। 'তোমাকে আমরা ভালবাসি। কিন্তু আমাদেরও তো জীবন আছে, আছে প্রয়োজন। আমাদেরও তো বেঁচে থাকতে হবে।'

'মা! বাবা! তোমরা এ কাজ করতে পারলে?' ভয়ে বিস্ময়ে গলা বুজে এল রাকিবের।

ওর বাবা খিকখিক করে হেসে উঠলেন। 'ওই যে বললাম আমাদেরও বেঁচে থাকতে হবে।'

'সবারই জীবন আছে, আছে প্রয়োজন,' বাবার সঙ্গে তাল মেলালেন মা।

এক পা পিছিয়ে গেল রাকিব। ঘুরে দাঁড়াল। দৌড় দেবে। তার আগেই শক্তিশালী একজোড়া হাত চেপে ধরল ওকে পেছন থেকে।

হপ্তাখানেক পরে সেই দুই পুলিশ অফিসার আবার এল রাকিবদের বাসায়। রাকিবের বাবা-মা নিখোঁজ লিটন সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পারবেন কিনা জানতে।

'নাহ্, আপনাদের কোন সাহায্যই করতে পারছি না আমরা,' বললেন রাকিবের বাবা।

'আপনার ছেলের কী খবর?' জিজ্ঞেস করল মোটা অফিসার। 'সে কিছু বলতে পারবে?'

'রাকিবকে আমরা বরিশালে, ওর চাচার বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ঢাকা শহরে তো শিশুরা নিরাপদ নয়। কোন্ ভরসায় রাকিবকে আমরা এখানে রাখব?'

'হয়তো বলতে পারেন আমরা বেশি বেশি ভয় পাচ্ছি,' যোগ করলেন রাকিবের মা। 'কিন্তু–'

'না, ঠিকই আছে,' বাধা দিল অফিসার। 'সন্তানের নিরাপত্তার জন্যে বাবা-মাকেই সবচে' সাবধান থাকতে হবে।'

'ঠিক বলেছেন,' তাঁকে সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন রাকিবের বাবা। 'আজকাল আমাদের সবারই একটু বেশি সাবধানে থাকা দরকার।'

*** ডন উলফসনের 'দ্য হাউজ নেক্সট ডোর' অবলম্বনে**

হানাবাড়ি

মধুপুরের জঙ্গলে ক্যাম্পিং করতে এসেছে ওরা ক'জন। ফয়সাল, রাকিব, জাহিদ, বিল্টুসহ আরও কয়েকজন। ধানমন্ডি বয়েজ স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র সবাই। প্ল্যানটা ফয়সালের। ও-ই প্রস্তাবটা দিয়েছে 'অরণ্য অভিযান'-এর। এখানে একটা রেস্ট হাউস আছে। ফয়সালের প্রভাবশালী মেজর চাচাকে ভজিয়ে রেস্ট হাউসে উঠতে তেমন কষ্ট করতে হয়নি ওদের। আবদুল মোতালেব নামের এক লোক পাহারা দেয় ঘরটা। সে এটার দারোয়ান কাম বাবুর্চি। মোতালেবের সাথে ফয়সালের পরিচয় অনেক আগে। এখানে বছর দুই আগে একবার ছোট চাচার সাথে বেড়াতে এসেছিল ফয়সাল। প্রথম দিনেই রোমহর্ষক গল্পটা তাকে শুনিয়ে দেয় মোতালেব। নিষেধ করে জঙ্গলের পশ্চিম দিকে যেতে। ওদিকে নাকি প্রায় একশো বছরের পুরানো একটা বাড়ি আছে। স্থানীয় লোকজন নাম দিয়েছে হানাবাড়ি। ভূতের ভয়ে কেউ ধারেকাছেও ঘেঁষে না পরিত্যক্ত জমিদার বাড়িটার। শোনা যায়, ওই বাড়ির মালিক ছিলেন পড়ন্ত জমিদার বীরেন্দ্র নারায়ণ। নিজের কোন সন্তান ছিল না তাঁদের। তবে মা-বাপ হারা একমাত্র ভাগ্নে অমরনাথকে তিনি সন্তানের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন। অমরনাথের বয়স যখন পনেরো, সে সময় হঠাৎ এক রাতে অ্যাপেন্ডিসাইটিস ফেটে মারা যান বীরেন্দ্র চৌধুরী। নরক নেমে আসে অমরনাথের কপালে। কারণ তার মামী অমরনাথকে দু'চোখে দেখতে পারত না। জমিদারের মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর

বখে যাওয়া দুই শ্যালক স্বর্গবাসী জামাই বাবুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হাপিশ করার লোভে খুলনা থেকে চলে আসে ঢাকায় এবং গ্যাঁট হয়ে বসে জমিদার বাড়িতে। মামী এবং তার ভাইয়েরা মিলে এবার নিদারুণ অত্যাচার চালাতে শুরু করে অমরনাথের উপরে যাতে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় অমরনাথ। তবে তার আগে একটি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে সে। ধারণা করা হয়, তীব্র অবহেলা-অপমান এবং শারীরিক নির্যাতন অমরনাথের বুকের ভিতর জাগিয়ে তোলে ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা। আর তারই প্রতিফলন ছিল তার দুই অত্যাচারী মামা এবং মামীর নৃশংস মৃত্যু। ঘুমের মধ্যে ধারাল কুড়োলের আঘাতে দুই মামাকে জবাই করার পরে মামীকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে অমরনাথ। তারপর দেয়ালে রক্ত দিয়ে লিখে রেখে যায়, 'এই বাড়িতে কারও অনুপ্রবেশ সহ্য করা হবে না!'

তারপর অমরনাথ কোথায় চলে গেছে তার হদিশ কেউ পায়নি। কিন্তু পরিত্যক্ত জমিদার বাড়িতে বাস করার সাহসও কারও হয়নি। ওটা এখন রাজ্যের চামচিকে, ছুঁচো আর মাকড়সাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। বহু কালের অব্যবহৃত দরজা-জানালাগুলো সাংঘাতিক নড়বড়ে, সামান্য বাতাস বইলেই মাকড়সার জালে বোঝাই কড়ি-বরগা থেকে ভীতিকর সব আওয়াজ বেরুতে থাকে। অনেকেই নাকি রাতের বেলা মনুষ্য কণ্ঠের বুক হিম করা আর্তচিৎকার শুনেছে বাড়িটার ভিতর থেকে। অপঘাতে মরা লোকগুলোর অতৃপ্ত আত্মা বাড়িটাকে পাহারা দিয়ে রাখে, এই ভয়ে আশ-পাশের কেউ ভুলেও ওদিকে পা বাড়ায় না। এটা এখন সরকারী সম্পত্তি। তবে ভূমি জরিপকারী কোন সরকারী অফিসারকে কস্মিনকালেও ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেখেনি গ্রামের লোকজন।

সেবার মোতালেব মিয়ার মুখে গল্পটা শুনে যতটা না ভয়

পেয়েছিল ফয়সাল, তারচে' অনেক বেশি আগ্রহ জেগেছে হানাবাড়িটাকে কাছে থেকে দেখতে। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টে হঠাৎ কী একটা জরুরী কাজ পড়ে যাওয়ায় ছোট চাচা তড়িঘড়ি ঢাকা ফিরে এলে ফয়সালকে হানাবাড়ির রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা থেকে বাধ্য হয়ে নিবৃত্ত থাকতে হয়। এবার অবশ্য ফয়সাল মধুপুরে এসেছে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তবে সে কথা একটু পরে বলছি।

ফয়সালের প্রাণের বন্ধু রাকিব আর জানের শত্রু হলো বিল্টু। বিল্টু ক্লাসের ফার্স্ট বয়। বিল্টু ওদের ক্লাসে ভর্তি হবার আগে এক নম্বর রোলটা ফয়সালেরই ছিল। কিন্তু বিল্টু এসে প্রমাণ করে দিল তার কাছে ফয়সাল কিছু না। মফস্বলের একটা ছেলে হঠাৎ তাকে এভাবে ল্যাং মারবে, কল্পনাও করেনি ফয়সাল। শুধু পড়াশোনা কেন, তারমত ভাল ফুটবল খেলতে পারে না স্কুলের কেউ। ফলে অল্পদিনেই টীচারদের প্রিয় পাত্র হয়ে যায় বাদল রায় ওরফে বিল্টু। ওদিকে 'স্মার্ট' ছেলে বলে খ্যাত ফয়সাল আহমেদের জনপ্রিয়তা হু হু করে নেমে গেছে। বিল্টুকে 'বিট' করার নানা ধান্ধা করেছে ফয়সাল। কিন্তু প্রতিবারই আশ্চর্য উপায়ে সে সব ষড়যন্ত্র আগে থেকে টের পেয়ে সাবধান হয়ে গেছে বিল্টু। ফলে ওকে ফাঁসানোর সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়েছে ফয়সালের। শেষে মরিয়া হয়ে শেষ চালটা চেলেছে ফয়সাল। বিল্টুকে প্রস্তাব দিয়েছে, 'চলো, মধুপুর থেকে ঘুরে আসি। ওখানে একটা হানাবাড়ি আছে। সাহস থাকলে একটা রাত বাড়িটাতে কাটিয়ে এসো।'

ফয়সালের চ্যালেঞ্জ হাসি মুখে গ্রহণ করেছে বিল্টু। ভূত-টূতের ভয় তার একদম নেই। সে মধুপুরে যেতে রাজি হয়েছে জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। বিল্টু জানে, ফয়সাল তাকে পছন্দ করে না। বন্ধুত্বটা স্রেফ লোক দেখানো। তবে বিল্টুর আচরণে আজ পর্যন্ত এমন কিছু প্রকাশ পায়নি যাতে সহপাঠীদের মনে কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক হয়। ফয়সালের সাথে সব সময়

হাসিমুখেই কথা বলে বিল্টু। সেধে স্কুলের সামনে ঘোড়া মিয়ার এক চালা রেস্টুরেন্টের গরম সিঙ্গাড়াও খাওয়ায়। দু'জনের কৃত্রিম সখ্যতা দেখে বোঝার উপায় নেই এদের মধ্যে একজন আরেকজনের রক্ত পান করার তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে আছে। ফয়সাল কী উদ্দেশে তাকে মধুপুরের জঙ্গলে নিয়ে যেতে চাইছে বিল্টুর তা অজানা নেই। হানাবাড়ির গল্প তাকে ফয়সাল একাধিকবার শুনিয়েছে। তবে ফয়সাল একটু বেশি চালাক বলে বিল্টুর রহস্যময় হাসির মানে বুঝতে পারেনি। যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেত ওকে নিয়ে বিল্টুও এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা ফেঁদেছে, মধুপুর দূরে থাক, বাড়ি থেকেই সে বের হবার সাহস পেত না।

ঢাকা থেকে মধুপুর খুব বেশি দূরে নয়। ভাড়া করা মাইক্রোবাসে চড়ে দুপুর নাগাদ ছেলেদের দলটা পৌঁছে গেল গন্তব্যে। ওরা দু'দিন থাকবে এখানে। শুক্র-শনি স্কুল বন্ধ। রোববার সকালেই আবার ঢাকা ফিরে আসবে।

শুক্রবার রাতে দলের ছেলেদের কাছে গল্পটা বলল ফয়সাল। এটাও জানাল পরদিন রাতটা ভূতুড়ে ওই বাড়িতে কাটানোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে বিল্টু। শুনে আঁতকে উঠল সুমন। ভূতের ভয় ওর সাংঘাতিক। চোখ বড় বড় করে বলল, 'খবরদার ও কাজ ভুলেও করতে যেয়ো না, বিল্টু। নির্ঘাত জানে মারা পড়বে।' বলে গড়গড় করে সনি চ্যানেলে কয়েকদিন আগে দেখা হরর সিরিজ 'আহাত'-এর একটা গল্প বলে ফেলল সে। ওই ছবিতেও এক বন্ধু বাজি ধরে এক হানাবাড়িতে রাত কাটাতে গিয়েছিল। পরে বুকে ছুরি বিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় তাকে। হানাবাড়ির পিশাচরা মেরে ফেলেছে ওকে।

গল্পটা শুনে ওকে তেড়ে প্রায় মারতে এল জাহিদ। 'আরে যা! যা! তুই শালা আছিস শুধু হরর ছবি নিয়ে। ওসব ভূত-প্রেত শুধু ফিল্ম আর টিভিতেই দেখা যায়। হরর ছবি দেখে আর ভূতের গল্প পড়ে তোর মাথাটাই গেছে। বিল্টু! ঘাবড়াসনে, দোস্ত। দরকার

হলে আমি তোর সাথে যাব। একরাত কাটিয়ে আসব হানাবাড়িতে।'

বাধা দিল ফয়সাল। 'তার আর দরকার হবে না। আমি নিজে বিল্টুকে ও বাড়িতে নিয়ে যাব। ওকে ওখানে রেখে আবার চলে আসব।'

মৃদু হাসল বিল্টু। 'রাতের আঁধারে একা ফিরতে পারবে তো ক্যাম্পে? ভয় করবে না?'

চটে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ফয়সাল। তীব্র ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে। 'কে ভয় পায় তা যথাসময়েই প্রমাণ হবে। দরকার হলে আমি থাকব তোমার সাথে ও বাড়িতে।'

কোন মন্তব্য করল না বিল্টু। ঠোঁটে সেই পিত্তি জ্বালানো রহস্যময় হাসিটা ফুটেই থাকল।

পরদিন রাত দশটায় বিল্টুকে নিয়ে হানাবাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো ফয়সাল। সঙ্গে আছে টর্চ, মোমবাতি আর রাতে খিদে পেলে কিছু শুকনো স্ন্যাকস। সুমন ওদের পইপই করে নিষেধ করল যেতে। কিন্তু মানা শুনল না বিল্টু। ফয়সাল ওর পথ-প্রদর্শক। হাতে টর্চ নিয়ে হন হন করে এগোচ্ছে ফয়সাল মসৃণ আল ধরে, পেছনে ওকে অনুসরণ করল বিল্টু কাঁধে একটা হ্যাভারস্যাক ঝুলিয়ে। অদ্ভুত, সরু চোখে তাকিয়ে আছে সে ফয়সালের দিকে।

বিল্টুকে হানাবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফেরার কথা থাকলেও ফিরল না ফয়সাল। চিন্তায় পড়ে গেল রাকিব। ওকে সান্ত্বনা দিল জাহিদ। 'ভয়ের কিছু নেই। ফয়সালের হয়তো একা ফিরতে ডর লাগছিল তাই বিল্টু সাথে থেকে গেছে। যদি বলত, চলো, আমরাও গিয়ে পাত্তি লাগাই।'

এত রাতে জঙ্গল ঠেঙিয়ে ভূতুড়ে বাড়িটাতে যাবার কথা মনে হতেই বুক শুকিয়ে গেল রাকিবের। ফয়সাল, বিল্টু বা জাহিদের মত অত সাহসী নয় সে। এসব বাজি-টাজি ধরতেও তার কোন

আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ফয়সালের একান্ত অনুরোধ ফেলতে না পেরে এখানে আসতেই হয়েছে রাকিবকে। শত হলেও জিগরী দোস্ত। তবে বিল্টুকে খামোকা ভয় দেখানোর প্রস্তাবটি মনঃপূত হয়নি তার। ফয়সালকে নিষেধও করেছিল রাকিব।

'আরে, ব্যাপারটা এত সিরিয়াসভাবে নিচ্ছিস কেন?' ওর কাঁধে চাপড় মেরে বলেছিল ফয়সাল। 'ফান ইজ ফান। আসলে ব্যাটাকে ডর দেখিয়ে সাইজ করতে চাইছি আমি। ওকে নিয়ে এমন খেলা খেলব যে আর কোনদিন আমার সামনে চোখ তুলে দাঁড়াতে হবে না।'

'দেখিস নিজেই যেন সাইজ হয়ে যাসনে আবার,' বন্ধুকে সাবধান করেছে রাকিব। হা হা করে হেসে উঠেছে ফয়সাল। 'আরে, আমার নাম ফয়সাল আহমেদ খান। একবার যার ওপর আমার রোখ চাপে তার চিতার ছাই উড়িয়ে দেখি আমি।'

সে রাতে ভাল ঘুম হলো না রাকিবের। প্রায় ভোর রাতের দিকে বিকট এক দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে গেল সে। জাহিদকে ঠেলে তুলল ও ঘুম থেকে। 'চলো, ওরা কী করছে দেখে আসি।'

এককথায় রাজি জাহিদ। মুখটুখ ধুয়ে দ্রুত রেডি হয়ে নিল সে। সুমন প্রথমে বলেছিল যাবে না। কিন্তু এতবড় রেস্ট হাউসে একা থাকতেও ওর ভয়। আবদুল মোতালেবের জ্বর। সে নিজের বাড়িতে। অগত্যা মুখখানা বাংলা পাঁচের মত করে দুই বন্ধুর সাথে রওনা হতে হলো বেচারাকে। মাইলখানেক হাঁটতে হলো ওদেরকে হানাবাড়িতে পৌঁছুতে। দূর থেকে চাঁদের আলোতে ভৌতিক কাঠামোটাকে দেখে বুকের ভিতর গুড়গুড় করে উঠল সুমনের। নভেম্বর মাস। বেশ শীত পড়েছে। হালকা কুয়াশার চাদর ঘিরে আছে কাঠের প্রকাণ্ড বাড়িটাকে। যতই সামনে এগোল বুকের ভিতর একটা চাপ অনুভব করল সুমন। দ্রুত একবার জাহিদ আর রাকিবের দিকে তাকাল সে। জাহিদের চেহারায় উত্তেজনার ছাপ। যেন গুপ্তধন আবিষ্কার করতে চলেছে। তবে মুখ কালো

করে কী যেন ভাবছে রাকিব।

কালো, আবলুস কাঠের সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল তিনজনের দলটা। ধাক্কা দিতেই ক্যাঁ-অ্যা-চ করে খুলে গেল কবাট। ঠিক সেই মুহূর্তে দোতলা থেকে তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার ভেসে এল। চিৎকারটা শুনে তিনজনের প্রতিক্রিয়া হলো তিন রকম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, যাক্, ফয়সাল ওরা তা হলে ঠিকই আছে। সে জানে, চিৎকারটা নকল। টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করা কৃত্রিম চিৎকার। ফয়সাল আগেই ওকে বলেছিল বিল্টুকে ভয় দেখানোর জন্য সে রেকর্ডারে চিৎকার, চেঁচামেচি, কুকুরের ডাক, পায়ের শব্দ ইত্যাদি রেকর্ড করে রেখেছে। কাজটা সে করেছে দলবল নিয়ে মধুপুরে আসার আগের দিন। তার এই দুষ্কর্মের সঙ্গী ছিল যথারীতি রাকিব। ওকে জোর করে নিয়ে এসেছিল ফয়সাল। হানাবাড়িতে রেকর্ডার, সাউন্ডবক্স এমনভাবে ফিট করে রেখেছে যেন অটোমেটিক ভাবে ওগুলো বাজতে থাকে। এখন তাই বাজছে।

তীক্ষ্ণ চিৎকারটা শুনে ভয়ে নীল হয়ে গেল সুমন। খামচে ধরল সে জাহিদের কনুই। ওর দিকে তাকিয়ে অভয় হাসি দিল জাহিদ। 'খামোকাই ভয় পাচ্ছিস তুই, সুমন। ফয়সাল আসলে আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে। কিন্তু সবজান্তা শমসের তো আর জানে না ওর এসব ট্রিকসের ধান্ধাবাজি আমি ধরে ফেলেছি। ও আসলে রেকর্ডার বাজাচ্ছে।'

'কী করে বুঝলি?' অবিশ্বাসের সুর সুমনের গলায়।

'ওই দ্যাখ!' সিঁড়িঘরের দিকে হাত প্রসারিত করল জাহিদ। 'দোতলার সিঁড়ির শেষ ধাপের নীচে তাকা। একটা লুকানো সাউন্ড বক্স দেখতে পাবি।'

সত্যি তাই। পাঁচ ব্যাটারির শক্তিশালী টর্চের আলোতে ছোট একটা সাউন্ড বক্স দেখা যাচ্ছে ওখানে। জাহিদের প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল সুমনের। নাহ্, জাহিদটার সাহস আছে স্বীকার

করতেই হবে। আর পর্যবেক্ষণ শক্তিও সাংঘাতিক তীক্ষ্ণ। রাকিব নিজেও অবাক হয়ে গেল। তবে চেহারায় ভাবটা ফুটতে দিল না সে। 'চল্, দোতলায় যাই। দেখি ওখানে ওরা আছে নাকি।' বলে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল সে।

সিঁড়িতে পা রেখেছে রাকিব, হঠাৎ দোতলা থেকে ভেসে এল পায়ের শব্দ। কে যেন পা ঘষটে আসছে এদিকেই।

'ফয়সাল?' গলা চড়িয়ে ডাকল রাকিব। থেমে গেল পদশব্দ।

'ফয়সালটা দেখি ফাজলামো শুরু করেছে আমাদের সাথে,' বিরক্তি প্রকাশ করল জাহিদ। 'শালাকে লাগাব এক চড়।'

ওর কথা শেষও হলো না, অমানুষিক গলায় দোতলা থেকে তীক্ষ্ণ, তীব্র চিৎকার করে উঠল কেউ। চিৎকারটা প্রলম্বিত, ভয়াবহ। এমনকী জাহিদের গায়ের রোম পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেল।

'ফ-ফয়সাল!' কাঁপা গলায় বৃথাই জোর আনার চেষ্টা করল সুমন। 'ভা-ভাল হবে না বলছি।'

যেভাবে শুরু হয়েছিল, সেভাবেই হঠাৎ করে থেমে গেল চিৎকার। ওরা তিনজন জুতোর শব্দ তুলে এবার উঠে এল দোতলায়। এদিক-ওদিক তাকাল। দেখা যাচ্ছে না কাউকে। ওদের সাড়া পেয়ে কয়েকটা ধাড়ি ইঁদুর প্রায় গায়ের উপর দিয়ে ছুটে পালাল। আঁতকে উঠল সুমন। ওর অবস্থা দেখে হেসে ফেলল জাহিদ। কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছে, হঠাৎ থপ থপ আওয়াজ শুনে থেমে গেল সে। শব্দটা ক্রমশ কাছিয়ে আসছে। যেন কেউ হেঁটে আসছে কাঠের মেঝের উপর হাতির মত পা ফেলে। 'ফয়সাল?' গলা চড়াল রাকিব। 'নাকি বিল্টু তুই?'

থপ থপ শব্দটা ক্রমশ জোরাল হয়ে উঠল। কিন্তু দেখা গেল না কাউকে।

'দুই হারামজাদা দেখি ভালই ফাজলামো শুরু করেছে আমাদের সাথে।' দাঁত কিড়মিড় করল জাহিদ। 'অনেক হয়েছে ফয়সাল এবং বিল্টু। এবার তোমাদের চাঁদ বদন দুটো দেখাও

দেখি বাছাধনেরা।'

কিন্তু ফয়সাল বা বিল্টুর কোন পাত্তা দেখা গেল না। শুধু থপ থপ আওয়াজটা বেড়ে চলল। চিলেকোঠার দিক থেকেই যেন শব্দটা আসছে, কান খাড়া করে শুনল রাকিব। হুম্, ঠিক তাই। 'চল তো, একটু খুঁজে দেখি ওরা কোথায় বসে লুকোচুরি খেলছে।'

আক্ষরিক অর্থেই ভাবনায় পড়ে গেছে রাকিব। এমন তো কথা ছিল না। দ্রুত একবার ঘড়িতে চোখ বোলাল সে। সকাল পাঁচটা বাজে। বাইরেটা এখনও চাপ চাপ অন্ধকার। তবে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদের আলো ক্রমশ ফিকে হয়ে আসতে শুরু করেছে। দোতলায় বেশ বড় বড় জানালা। গরাদহীন একটা জানালা খোলা। হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ভিতরে। শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে। রাকিব চিলেকোঠার দিকে এগোল। চিলেকোঠাটা বেশ বড়। আগেরবার দেখে গেছে সে। তবে ভিতরে ঢোকার সাহস পায়নি। ফয়সালের কাছে শুনেছে এ ঘরেই নাকি অমরনাথ তার দুই মামাকে কুপিয়ে মেরেছে। প্রচণ্ড গরমের সেই রাতে ওরা দু'জন চিলেকোঠার ঘরে ঘুমিয়েছিল দখিনা বাতাসের লোভে।

সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠায় চলে এল রাকিবরা। হাত বাড়াল কবাটের দিকে। কোন সন্দেহ নেই, থপ্ থপ্ শব্দটা এই ঘরের ভিতর থেকেই আসছে। হঠাৎ থেমে গেল থপ্ থপ্। আরেকটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। যেন টপ টপ্ করে জল পড়ছে মেঝের উপর। দরজায় ধাক্কা মারল রাকিব দম বন্ধ করে। এবং চিৎকার করে উঠল সাথে সাথে।

কড়ি কাঠের সাথে, দড়ির ফাঁসে ঝুলছে ফয়সাল। খোলা পা দুটো কাঠের দেয়ালে গিয়ে লাগছে থেকে থেকে, শব্দ হচ্ছে থপ্ থপ্। বিস্ফারিত এবং আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে ওদের দিকে। গলাটা দু'ভাগ করা। গলা বেয়ে রক্ত পড়ছে মেঝের উপর। শব্দ হচ্ছে টপ...টপ...টপ...

'ব্যাটা দেখি ভালই ভড়ং ধরতে জানে,' নিজেকে ইতিমধ্যে

সামলে নিয়েছে জাহিদ। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। 'গলায় মিছে ফাঁস ঝুলিয়ে আর ফল্স্ রক্ত মেখে আমাদের ভয় দেখানোর কারসাজি, না? দাঁড়া! দেখাচ্ছি মজা!'

ওর হাত টেনে ধরল রাকিব। আস্তে গিয়ে দাঁড়াল ঝুলন্ত শরীরটার সামনে। ফয়সালের ফাঁকা এবং ভয়ার্ত চাউনি দেখেই বোঝা যায় ভড়ং করছে না সে। মারা গেছে অন্তত দু'তিন ঘণ্টা আগে। ওকে নির্মমভাবে কুপিয়ে মারা হয়েছে। লাশটার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে এবং অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল রাকিব। মনে পড়ে গেল রোমহর্ষক সেই গল্পটা। ঠিক এভাবে কুপিয়ে, মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছিল অমরনাথ তার দুই মামাকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে।

কিন্তু কে? কেন মারল ফয়সালকে? জবাবটাও পেয়ে গেল সে তক্ষুণি। এক পাশের দেয়ালে, রক্ত দিয়ে লেখা–ফয়সালের রক্ত–একটা নাম লেখা অমরনাথ।

অমরনাথ চৌধুরী ফিরে এসেছিল। চলে গেছে আরেক বার প্রতিশোধ নিয়ে।

[বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে]